২০০২

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ◆ ৭ম সংখ্যা

১৫ অক্টোবর, ২০০২ ঈসাব্দ

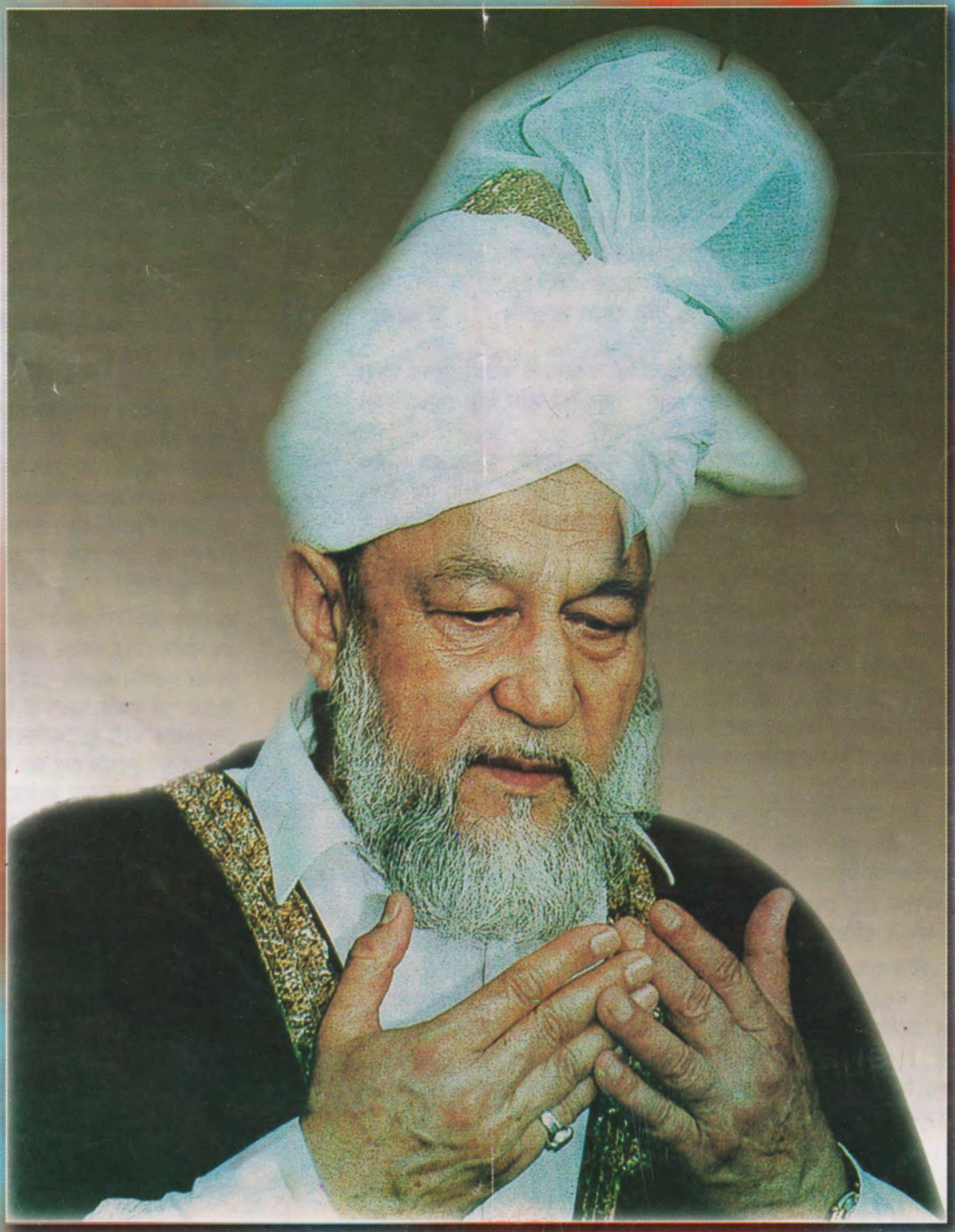

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
   ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
   খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
   গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

সিয়াম সাধনায় মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিন

আর কিছুদিন পরেই পবিত্র মাহে রমযানের রোযা আরম্ভ হবে। এ মাসে যারা বাড়ীতে থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন নর ও নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যে রোযা রাখা ফরয। রমযান আসে মানবাত্মায় সারা বছরের জমাকৃত পাপ-রূপ ক্লেদ ও নোংরা-ময়লাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে আত্মাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করার জন্যে। সুতরাং আত্মার পরিশুদ্ধির জন্যে রোযা-রূপ চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের সকলের উপকৃত হওয়া দরকার। আর সেজন্যে চাই মানসিক প্রস্তুতি। করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যেকের ঐকান্তিকভাবে দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্‌তাআলা এ পবিত্র মাসে সুস্থ রাখেন এবং রোযা ব্রত পালন করার সৌভাগ্য দান করেন।

আল্লাহ্‌তাআলার পাক কালাম কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হওয়ার সাথে পবিত্র রমযানের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ মাসেই কুরআন পাক অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয় এবং শেষ হয়। তাই এ মাসে কুরআন মাজীদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা, এর অর্থ ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা বিশেষ জরুরী। প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের এদিকে সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। স্থানীয় জামাতের কর্মকর্তাগণ এ প্রসঙ্গে কর্মসূচী প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন। যারা কুরআন করীম নাযেরা পড়তে পারে না তাদের তা শিখানোর ব্যবস্থা করবেন। এজন্যে আনসার ভাইদের সাহায্য নিতে পারেন। কুরআন শিখানো তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যারা নাযেরা পড়তে পারেন তারা তরজমা শেখার চেষ্টা করবেন এবং সারা মাস যেন মসজিদগুলোতে এবং প্রয়োজনবোধে হালকাগুলোতেও কুরআনের দরসের ব্যবস্থা করা হয়। শিখাবার টারগেট নির্ধারণ করে মাস শেষে পর্যালোচনা করবেন যে, আপনারা কতটুকু সফলতা লাভ করেছেন।

রমযানের একটি বিশেষ ইবাদত হলো তারাবীহ্-এর নামায। সারা রমযান মাসে তারাবীহের নামাযে কুরআন একবার খতম করা ভাল। যারা নাযেরা পাঠ করতে পারেন না বা রোজ তেলাওয়াত করার সুযোগ পান না তাদেরও একবার পূর্ণ কুরআন শুনা হয়ে যায়। তাই যেসব জামাতে হাফেয আছেন তাদেরকে দিয়ে খতম তারাবীহ্‌র নামাযের ব্যবস্থা নিয়ে খাকসারকে অবহিত করবেন।

রমযান মাসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি পাঠ করাও জরুরী। কেননা, এসব পুস্তকাদি কুরআন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় ভরপুর। ইদানীং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকখানা পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ পুস্তকগুলো সংগ্রহ করে সকলে রমযান মাসে পাঠ করবেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে পবিত্র রমযান সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

৩০ আশ্বিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ৮ শাবান ১৪২৩ হিঃ কাঃ
১৫ ইহসান ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ অক্টোবর ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫

E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

সুস্বাগতম মাহে রমযান

আর কয়েকদিন পরেই শুরু হতে যাচ্ছে মাহে রমযান-পবিত্র সাধনার মাস। মু'মিনের আধ্যাত্মিক কাননে ঘটবে নব-বসন্তের সমারোহ। আনন্দে হিল্লোলিত হবে তার হৃদয়-ভুবন। সাধক-মধুকরেরা ক্ষণে ক্ষণে আহরণ করতে থাকবে আধ্যাত্মিক পুষ্পরস। সঞ্চিত করতে থাকবে সারা বছরের জন্যে জীবন-বারি। আমরা মাহে রমযানকে জানাই সুস্বাগতম।

মাহে রমযান আসে আমাদের জন্যে বাড়তি কতক ইবাদত বন্দেগীর সুযোগ নিয়ে। রমযানের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে সম্পাদনে মু'মিন পুরস্কার পাবে সরাসরি আল্লাহ্তাআলার নিকট থেকে বা স্বয়ং তাঁকেই। রোযা বাদে অন্য কোন ইবাদতের পুরস্কার আল্লাহ্ স্বয়ং হবেন- এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় নি কোথাও।

রমযানের রোযা রাখার সাথে সাথে কুরআন তেলাওয়াত-পারলে কমপক্ষে পুরো কুরআন মাজীদ একবার পাঠ শেষ করা বাঞ্ছনীয় এবং এর দরসের ব্যবস্থা করতে হবে ও শুনতে হবে। তারাবীহ্, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামাযের মাধ্যমে করতে হবে রাতগুলোকে জাগ্রত। রোযার আর এক কাম্য হলো দীন-দুঃখীদের অভাব উপলব্ধি করা। এ লক্ষ্যে আর্থিক কুরবানীকে সতেজ করতে হবে। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে এ সৌভাগ্য দান করুন।

আমাদের মামলা আল্লাহ্র দরবারে!

পত্রিকান্তরে বিচারপতি বারী কমিশনের রিপোর্টের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কমিশন ৩০ জুন ১৯৯৬ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাতটি বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে তদন্ত করে ১২৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন সরকারের কাছে। এতে খুলনার 'কাদিয়ানী' মসজিদে বোমা হামলা সম্পর্কে কমিশন বলেছেন, "কাদিয়ানীরা সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে মসজিদের ভেতর নিজেরাই বোমা রেখেছিল। অসাবধানতাবশতঃ এটি বিস্ফোরিত হয়" (প্রথম আলো ঃ ২০-৯-২০০২)।

পত্রিকান্তরে আরও জানা যায় যে, তিন সদস্য বিশিষ্ট এ কমিশনের রিপোর্টটি বিচারপতি আব্দুল বারী সরকারের ব্যক্তিগত মতামত। অন্য দু'জন সদস্য এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন (ডেইলী স্টার, ৩০-৯-২০০২)।

বিচারপতি বারী কমিশনের এ রিপোর্ট যে বানোয়াট, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও পক্ষপাতদুষ্ট, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে নিজের বাড়ীতে বোমা পেতে রাখা কারও পক্ষে সমীচীন মনে করা অবাস্তব ও পাগলামী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। কমিশন সঠিকভাবে তদন্ত ছাড়াই এহেন হাস্যাস্পদ রিপোর্ট তৈরী করেছে বলে মনে করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের পরে সপ্তাহখানেক ধরে পত্র-পত্রিকায় এতদ্সংশ্লিষ্ট যেসব রিপোর্ট ও সংবাদ বের হয়েছে কমিটি যদি তা বিচার-বিশ্লেষণ করতেন তাহলে সত্যিকারের দোষীকে ধরা তাদের জন্যে কষ্টকর হতো না।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সারা বিশ্বের ১৭০টি রাষ্ট্রে একটি আইনানুগ শান্তিপ্রিয় ইসলামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত শত বছরের অধিক সময় ধরে এ জামাত সুনামের সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ জামাতের সচ্চরিত্র, সততা ও আনুগত্য সম্বন্ধে কোন দুর্মুখও এ পর্যন্ত প্রশ্ন তুলতে পারে নি।

বিচারপতি বারীর রিপোর্টে জাতি আশ্চর্য হতে পারে। অনেক সুহৃদ ব্যক্তি তাদের ক্ষুরধার লেখনীতে এর নিন্দা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হই নি। কেননা, পাকিস্তানের এক শ্রেণীর বিচারপতিরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে বিগত ৩ দশক ধরে এ ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট ফয়সালা দিয়ে আসছেন। এগুলো আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

বিচারপতি বারী সাহেব রিপোর্টে 'ধান ভানতে শীবের গীত গেয়েছেন'। কাদিয়ানীদের আলাদা কমিউনিটি ঘোষণা করার জন্যে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন (ডেইল স্টার ঃ ৩০-৯-২০০২)। বোমার তদন্তের সাথে এর কী সম্পর্ক তা ভেবে পাওয়া দুঃসাধ্য। ইসলামের অন্যান্য কতিপয় ফিরকার মত আমরাও নিজেদের মসজিদ তৈরী করে আলাদাভাবে ইবাদত বন্দেগী করে থাকি। সুতরাং এ প্রশ্ন উঠানোও যে অসদুদ্দেশ্য -প্রণোদিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিচারপতি বারী যে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ক্রীড়াণক হয়ে এ ধরনের মন্তব্য বা সুপারিশ করেছেন তা বলাই বাহুল্য। জোট সরকার জোর গলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বার বার ঘোষণা করে আসছেন। কিন্তু তাঁদেরই নিযুক্ত কমিশন (যদিও এটা এক ব্যক্তির একক সুপারিশ)-এর পক্ষ থেকে এ ধরনের উক্তি যদি প্রকাশিত হয় তাহলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ব্যাপারটি যে প্রশ্নের উর্ধ্বে থাকবে না তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

বোমা বিস্ফোরণের পরে আমাদের প্রিয় খলীফা এর বিচার খোদার আদালতে পেশ করেছিলেন। আমরা কোন কোর্টে বা বিচারপতির নিকট যাই নি। আমাদের ৭ জন লোক শহীদ হয়েছেন। আমরা ধৈর্য ধারণ করেছি। অতীতের ন্যায় এর সুফল আল্লাহ্তাআলা অবশ্যই আমাদেরকে দিচ্ছেন ও দিবেন। তবে এ কথাও ঠিক এসব বিচারপতিদেরও একদিন সর্বোচ্চ বিচারকের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সেদিন বিচারপতি বারী সাহেবরা কী জবাব দিবেন?

-নির্বাহী সম্পাদক

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল বাকারাহ্ - ২	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ হাদীস শরীফ ঃ রোযা	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৪
■ অমৃত বাণী ঃ রোযার মাহাত্ম্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ	৪ ও ১৫
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
■ জুমুআর খুতবা ঃ রোযার বিভিন্ন দিক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৯-১৩
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৪-১৫
■ ঐশী-বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১৬-১৭
■ জলসার ভাষণ ঃ তরবিয়তে আওলাদ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৮-২৩
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৪-২৫
■ আধুনিক মরণ	ঃ জনাব মোহাম্মাদ মোস্তাফা আলী	২৫-২৬
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৭
■ প্রসঙ্গ ঃ রোযা	ঃ জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৮-২৯
■ বিবাহ	ঃ জনাব আলহাজ্জ আহমদ তৌফীক চৌধুরী	৩০-৩২
■ বিয়ের প্রাসঙ্গিক কথা	ঃ জনাব মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	৩৩-৩৫
■ জীবন মরণ	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	৩৬-৩৭
■ নতুনদের পাতা		
■ সংবাদ	ঃ	৩৮-৩৯
■ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস	ঃ	৪০

প্রচ্ছদ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) দোয়ারত অবস্থায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার রীতি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

- "খোদাতাআলা আমাকে দোয়ার এমন উদ্দীপনা দিয়েছেন যেভাবে সমুদ্রে একটি উচ্ছলতা থাকে" (মলফূযাত, ৩ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৭)।
- "আমি এত দোয়া করি যে, দোয়া করতে করতে দুর্বলতার শিকার হয়ে যাই আর কখনও কখনও মুর্ছা ও বিনাশ হওয়ার পালায় পড়ে যাই" (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০০)।
- "হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বলতেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দোয়াতে প্রথমে সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করতেন এবং পরে অন্য কোন দোয়া করতেন।"
- হুযূর (আঃ) বলেন,
  "আমরা তো এ দোয়া করি, খোদা জামাতকে হেফাযত করুন আর বিশ্বে প্রকাশিত হয়ে যায় যে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রকৃতই রসূল ছিলেন এবং খোদার সত্তার ওপরে লোকদের ঈমান সৃষ্টি হয়ে যায়" (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬১)।
- "সবচে" প্রথম ও আবশ্যকীয় দোয়া এই যে, মানুষ নিজেকে পাপ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে

কালামুল ইমাম

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়ার রীতি

দোয়া করে। সারা দোয়ার সমাধান ও অংশ এ দোয়াই কেননা যখন এ দোয়া কবুল হয়ে যায় আর মানুষ সব রকমের নোংরামি ও কলুষতা থেকে পাক-পবিত্র হয়ে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে সুগন্ধে অভিসিক্ত হয়ে গেলে অন্যান্য দোয়াগুলো যা তার প্রয়োজনের কারণে হয়ে থাকে তা তার চাইতেই হয় না। উহা নিজে নিজেই কবুল হয়ে যেতে থাকে। এ দোয়া অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের প্রত্যাশী যে, ঐ ব্যক্তি যে দোয়া করে সে যেন পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যায় আর খোদার দৃষ্টিতে খোদা-ভীরু ও নিষ্ঠাবান বলে প্রতীয়মান হয়ে যায়" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬১৭)।

- "আমার নিকট বার বার এ ইলহাম হয়েছে যে, **উজীবু কুল্লা দু'আয়িকা**- অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়া যা নিজের সত্তার উপকারী ও কল্যাণজনক তা কবুল হয়ে যায় ... যখন প্রথম প্রথম আমার নিকট এ ইলহাম হয় ... তখন আমি খুবই খুশী হলাম যে, আমার দোয়া ও আমার বন্ধুগণের প্রসঙ্গে যে দোয়া করা হবে তা অবশ্যই কবুল করবেন ... অতএব আমি বন্ধুদের জন্যে এ নীতি নির্ধারণ করে রাখলাম যে, তারা স্মরণ করিয়ে দিক বা না দিক কোন কঠিন বিষয় হোক বা না হোক তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণের জন্যে দোয়া করে থাকি " (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৮)।
- "যে ব্যক্তি চায় যে, আমরা তাকে আদর করি আর তার পক্ষে আমাদের দোয়া উৎসর্গ ও উদ্দীপনার সাথে আসমানে যায়, সে আমাদেরকে এ কথার নিশ্চয়তা দিক যে, সে ইসলামের সেবক হওয়ার যোগ্যতা রাখে" (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১১)।
- "যে অবস্থা আমার একাগ্রতাকে আকর্ষণ করে আর যাকে দেখে আমি আমার মধ্যে দোয়ার আবেগ অনুভব করি তা একই কথা যে, আমি কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গে জেনে নিই যে, এ ব্যক্তি ধর্মের সেবার জন্যে যোগ্য আর তার সত্তা খোদাতাআলার জন্যে, খোদার রসূল (সঃ)-এর জন্যে, খোদার কিতাবের ও খোদার বান্দাদের জন্যে উপকারী, এমন ব্যক্তির যে দুঃখ-কষ্ট হয় তা প্রকৃতপক্ষে আমারও হয়ে থাকে" (মলফূযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৫)। (চলবে)

উপস্থাপন ও অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সূরাতুল বাকারাহ্ - ২

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা ফরয করা হলো, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের[২০৬] জন্যে ফরয করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫। নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র, তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ বা সফরে আছে তার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়, আর যারা এর (রোযার) সামর্থ্য রাখে না[২০৭] তাদের জন্যে 'ফিদিয়া' হলো ঃ একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো। অতএব যে স্বেচ্ছায় ভালকাজ করে তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬। রমযান[২০৭-ক] সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) আল্ কুরআন নাযেল[২০৭-খ] করা হয়েছে মানবজাতির জন্য[২০৮] এক মহান হেদায়াত এবং হেদায়াত ও 'ফুরকান' (অর্থাৎ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী বিষয়াদি)-এর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে; অতএব তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পায় সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে অসুস্থ বা সফরে থাকে তার জন্য অন্যান্য দিনে[২০৯] (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়: আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি যে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন সেজন্যে তোমরা যেন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর আর তোমরা যেন তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলোতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাসব্রত একটি সাধারণভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এ ধরনের নির্দেশ নেই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট)। সাধুপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্কসমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে ইসলাম এ উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গস্বরূপ মনে করে থাকে। যিনি রোযা পালন করেন তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হতেই বিরত থাকেন তেমন নয়, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ থেকেও দূরে থাকেন। অতএব যিনি রোযা রাখেন তিনি তাঁর প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন যে, প্রয়োজনবোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাঁর সবকিছু, এমনকি তাঁর জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে কুণ্ঠিত নন।

২০৭। 'ইয়ুতিকূনাহু'র অর্থ করা হয়েছে, যাদের পক্ষে বা যারা অতি কষ্টে এটা (রোযা) করতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকূনাহু' এ অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এ আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেয়া হয়েছে- অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দুর্বলদেরকে। 'ইয়ুতিকূনাহু'র অর্থ এখানে "যারা রোযা রাখতে অসমর্থ" হতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এরূপও করা হয়েছে, রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গরীবদেরকে খাওয়াতে পারেন। সে ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকূনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে খাওয়ানোর পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

২০৭-ক। 'রযমান' চান্দ্রমাসগুলির মধ্যে নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়িমু' অর্থ রোযা রাখার কারণে রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এ কারণে হয়েছে ঃ (১) রোযার কারণে এ মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এ মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এ মাসটির পূর্ণনাম ছিল 'নাতিক' (কাসীর)।

২০৭-খ। রমযান মাসের চব্বিশ তারিখে হযরত রসূলে করীম (সঃ) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন (জরীর)। এ রমযান মাসেই জিব্‌রাঈল প্রতি বছর পূর্বে নাযেলকৃত সমস্ত বাণী রসূলে করীম (সঃ)-এর নিকট পুনরাবৃত্তি করতেন। এ ব্যবস্থা মহানবী (সঃ)-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ বৎসরের রমযান মাসে প্রধান ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সঃ)-এর কাছে দু'বার পাঠ করে শুনান (বুখারী)। এ হিসেবে বলা যেতে পারে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

২০৮। 'আল্ কুরআন' শব্দটি 'কারায়া' হতে উৎপন্ন। 'কারায়া' অর্থ সে পাঠ করেছিল, সে বাণী পৌছিয়েছিল, সে সংগ্রহ করেছিল। 'কুরআন' অর্থ ঃ (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যা বার বার পাঠ করা যায়; কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক (এন্‌সাইক্লো বৃট), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌছানো প্রয়োজন, কুরআনই একমাত্র পুস্তক যার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অবারিত। কেননা যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য এসেছে (৩৪ঃ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যা সকল সত্যকে ধারণ করে; কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। এতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলি তো স্থান লাভ করেছেই, উপরন্তু সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য এতে সংযোজিত হয়ে এটা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হয়েছে (৯৮ঃ৪; ১৮ঃ৫০)।

২০৯। এ বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে যাতে রোযা রাখার নির্দেশ তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ আয়াতে সে নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুস্থতা, 'ভ্রমণ' শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত না করে কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলোর অর্থ করার ভার ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

হাদীস শরীফ

রোযা

وَعَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهٗ حَدَّثَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ —رواه مسلم

অর্থাৎ হযরত আবূ আইয়্যুব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদের দিন বাদ দিয়ে) শওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও পূর্ণাঙ্গীণ শর্তাবলী সহকারে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচে' প্রিয়। কারণ, নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে যে, রোযা তোমাদের মাঝে তাকওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এই তাকওয়া কীভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুত রোযা এমন ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে খোদার সন্তুষ্টির জন্যে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে উহা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজায ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

হযরত রসূল করীম (সঃ) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কথা উল্লেখ করে এর গুরুত্ব বর্ণনা করছেন যে, রমযানের ৩০টি ও শাওয়ালের ৬টি মোট ৩৬টি রোযা যে রাখবে সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পেল। এক হাদীসে আছে, এক রোযার দশটি সওয়াব। এভাবে ৩৬ x ১০ মোট ৩৬০ হয় অর্থাৎ ৩৬০ দিন রোযা।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাকওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে এ তাকওয়া নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয় আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন এই রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা' প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ নফসে মুতমাইন্না'তে পরিণত হয়। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ,
মুরব্বী সেলসেলা

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

রোযার মাহাত্ম্য

❑ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করা ও আত্মশুদ্ধির জন্যে আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্ফী-তাকৃত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীক্রোধ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু ইহা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিক্র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সঃ) রমযান শরীফে অনেক বেশী ইবাদত করতেন। এই দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্তাআলার প্রতি মনোনিবেশ (তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্) করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্যে পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একইভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

❑ "কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে, মানুষ যতো কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং কাশ্ফী তাকৃত বা দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় ইহাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদাতাআলার যিক্র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যেই রোযা রাখে এবং আচার -অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না তার উচিত, সে যেন সর্বদা হাম্দ (প্রশংসা কীর্তন), তস্বীহ্ (আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহ্লীলের (আল্লাহ্র তৌহীদ ঘোষণা) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়"(আল হাকাম, ১৭/১/ ১৯০৭)।

❑"তৃতীয় বিষয়, যাহা ইসলামের মুল ভিত্তি, তা হ'ল রোযা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কেও মানুষ অনবহিত। প্রকৃত কথা এই যে, যে দেশে মানুষ যায় না এবং যে জগৎ সম্পর্কে সে অবহিত নয় সে এর অবস্থা কী বর্ণনা করবে? রোযা কেবল ইহাই নয় যে,

অবশিষ্টাংশ ১৫ পৃষ্ঠায়

আল্লাহ্‌তাআলার 'নূর' সিফাতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৮ জুন, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেন।

গত খুতবায় আল্লাহ্‌তাআলার সিফত 'নূর' সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলাম, আজকেও এ বিষয়ে আলোচনা করব, হয়ত আল্লাহ্‌র ফযলে ভবিষ্যতেও আরো কিছু দিন এ একই বিষয়ে আলোচনা চলবে।

সর্বপ্রথম 'লেসানুল আরব' হতে 'নূর' শব্দের আরো অর্থ বলছি। লেসানুল আরবে লেখা আছে, "নূর আল্লাহ্‌তাআলার নামগুলোর একটি"। আল্লামা ইবনুল আছির বলেছেন, 'নূর, এমন সত্তাকে বলা হয় যিনি নিজ "নূর দ্বারা অন্যদেরকে আলো দান করেন এবং নিজ হেদায়াত দ্বারা বিপথগামীদেরকে পথপ্রদর্শন করেন"। এটাও বলা হয়েছে যে, নূর এমন সত্তা যিনি স্বয়ং নিজে 'প্রকাশিত', স্পষ্ট, যাঁর করুণায় অন্য সবাই প্রকাশিত। সুতরাং নূর তিনি যিনি নিজেও প্রকাশিত এবং অন্যদেরকেও প্রকাশ করেন।

আল্লাহু নূরুস্ সামাওয়াত ওয়াল আরয-এর [অর্থ ঃ আকাশসমূহও পৃথিবীর (নূর) আলো আল্লাহ্] তফসীরে বলা হয়েছে, "এর অর্থ হোল, "আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুকে যিনি হেদায়াত দান করেন।" নূরের বিপরীত শব্দ অন্ধকার। যখন সকাল হয় তখনকার আলোকে তানভীর (আলোময়) বলা হয়।

'মানারুল হরম'-ঐ অঞ্চলকে বলা হয় যার সীমারেখা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) (কা'বা শরীফের আশপাশ) নির্ধারণ করেছিলেন যদ্বারা নিষিদ্ধ এলাকা ও উন্মুক্ত এলাকার পরিচয় পাওয়া যায়।

কাদ জায়াকুম-এর তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবশ্যই এসেছে নূর ও উন্মুক্ত কিতাব এখানে নূর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে বলা হয়েছে এবং এর অর্থ এই যে, তোমাদের কাছে নবী ও কিতাব উভয়ে এসেছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-কে কোন বিষয়ে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমাদের কাছে নিশ্চয় নূর আসবে।"

ওয়াত্তাবায়ূন্ নূরাল্লাযী উন্‌যিলা মায়াহু অর্থ ঃ "তোমরা ঐ নূরের অনুসরণ কর যা তাঁর সাথে নাযেল হয়েছে।" এর ব্যাখ্য এই যে, তোমরা সেই সত্যকে অনুসরণ কর যার সম্পর্ক তাঁর হৃদয়ের সাথে এরকম যেমন চোখের সাথে নূরের সম্পর্ক।"

বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে শিক্ষা (কিতাব) নিয়ে এসেছেন তা মানুষের অন্তরে

ক্রীয়াশীল হয় এবং অন্তরের কালিমা (অন্ধকার) দূর করে অর্থাৎ আলোর কাজ করে। আঁ হযরত (সঃ)-এর চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "আনোয়ারুল মুতাজাব্বাদ" অর্থাৎ তিনি অতি সুন্দর, চমৎকার, উজ্জ্বল শরীরের মানুষ ছিলেন (লিসানুল আরব)।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ তারা আল্লাহ্‌র নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ্‌র তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণ করা ছাড়া সব কিছু অস্বীকার করেন, যদিও অবিশ্বাসীরা তা পসন্দ করে না (সূরাতুত্তাওবা ঃ ৩২)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলেছেন, "আমার পরে তোমাদের ব্যাপারে যারা তত্ত্বাবধায়ক হবে তারা সুন্নত (সুন্নতের আলো) -কে নিবিয়ে দিবে এবং বিদআতকে (ধর্মের বিধান পরিবর্তন করে অন্য প্রথা চালু করা) চালু করবে। তারা নামাযকে যথাসময়ে আদায় না করে দেরী করে করবে" রেওয়ায়াতকারী বলেছেন, আমি আরয করেছি, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যদি এমন লোকদের দেখি তো কী করব? আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ যে, তুমি কী করবে? যারা সুন্নতকে অস্বীকার করে তাদের অনুসরণ করবে না!" (ইবনে মাজা, কিতাবুল জিহাদ)।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী সূরাতুত্তাওবার উপরোক্ত আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন, "জেনে রাখুন, এখানে ইহুদী খৃষ্টান নেতৃবর্গের অপকর্মের কথা বলা হয়েছে, যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর নতুওয়তের কার্যক্রমকে বিনষ্ট করার চেষ্টারত থাকত। এখানে যে নূরের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতার দলিল-প্রমাণ। যেমন ঃ (১) ঐ সমস্ত কহরী (ভয়ংকর) মু'জিযাসমূহ যা হুযূর (সঃ) প্রদর্শন করেছেন। কারণ মু'জিযা দ্বারা সত্যতার প্রমাণ হয়। আর যদি সত্যতা প্রমাণ হয়ে যায় তবে আঁ হযরত (সঃ)-এর নবুওয়ত সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়। আর যদি মু'জিযা দ্বারা সত্যতা প্রমাণিত না হয় তবে হযরত মূসা, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্যতা প্রমাণের পথ রুদ্ধ।

(২) হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা মহামূল্যবান কুরআন মাজীদ যা তাঁর (সঃ) পবিত্র মুখনিঃসৃত (আল্লাহ্‌র) বাণী এবং কিতাব। যদিও তিনি (সঃ) প্রথম জীবনে লেখা পড়া করেন নি; কোন বই পুস্তক পড়েন নি বা সে ধরনের কোন সুযোগই লাভ করেন নি, কোন বই দেখেন নি। কুরআন মজীদের মু'জিযা তাঁর (সঃ) সবচেয়ে বড় মু'জিযা।

(৩) আঁ হযরত (সঃ)-এর শরীয়তের সারাংশ হোল এই, আল্লাহ্‌র মহিমা ও তাঁর প্রশংসা করা এবং আনুগত্য করে যাওয়া এবং নিজ (নফ্‌স)-কে জাগতিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখা এবং নিজেকে পরকালের কল্যাণসমূহের মধ্যে ব্যস্ত রাখা এবং বিবেক বলে যে, এভাবেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব।

(৪) হুযূর (সঃ)-এর শরীয়ত সকল দোষত্রুটি ও মন্দ হতে মুক্ত।

দলিলসমূহকে এজন্য এখানে নূর বলা হয়েছে যে, নূর যেমন সঠিক বিষয়ের প্রতি দিক-নির্দেশনা দেয় তেমনই দলিলসমূহ ও ধর্মীয় বিষয়ে সঠিক পথের দিকে নির্দেশ করে" (তফসীরে কবীর, ইমাম রাযী)।

আল্লামা ইবনে হাইয়্যান সূরাতুত্তাওবার আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, "এখানে যারা আঁ হযরত (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায় আল্লাহ্‌তাআলা তাদের উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির সাথে দিয়েছেন, যে না কি এত বড় বিশাল আলো যা সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করছে এমন আলোকে মুখের ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে ফেলতে চায়। আল্লাহ্‌র নূর অর্থ ঐ সমস্ত হেদায়াত যা কুরআন মজীদে আছে"।

তফসীরকারকগণের এক দল 'নূর' অর্থ কুরআন করেছেন। 'মুখের ফুৎকারে নূর নিবিয়ে দেয়ার কথা আল্লাহ্ এখানে বলেছেন'। এর অর্থ এই যে, তাদের পরিকল্পনা খুবই দুর্বল এবং খুবই হেয়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, এতবড় পরিকল্পনাকে তারা এত নগণ্য প্রচেষ্টায় শেষ করতে চায়। তাদের এমন আকাঙ্ক্ষা এমনই যেমন তারা এত বড় নূরকে মুখের ফুৎকারে নিবিয়ে ফেলতে চায়" (তফসীর বাহরে মুহীত)।

ইবনে আবি হাতেম হযরত যেহাক (রাঃ)-এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা চেয়েছিল যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম যেন ধ্বংস হয়ে যায় এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ইবাদত যেন না হতে পারে।"

'তারা চায়' অর্থ আরবের কাফির এবং আহলে কিতাব লোকেরা চায় যারা আঁ হযরত (সঃ)-এর বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র কিতাবকে অস্বীকার করেছে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"দুষ্ট প্রকৃতির কাফির লোকেরা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহ্‌র নূরকে নিবিয়ে ফেলতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন, যদিও অস্বীকারকারীরা অপসন্দ করবে। মুখের ফুৎকার কী জিনিস? এতটুকুই যে, কেউ বলল, ঠিক, কেউ বলল, এ তো দোকানদার, কাফির, বেদীন। এরা এসব বলে আল্লাহ্‌র নূরকে নিবিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু তারা কখনও সফলকাম হবে না। আল্লাহ্‌র নূরকে নিবাতে গিয়ে তারা নিজেরাই শেষ হয়ে যাবে" (আল্ হাকাম, ৫ম খন্ড, ২৪, জানুয়ারী, ১৯০১ইং)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"এরা অযথা মুখে প্রলাপ বকছে যে, এ ধর্মের কখনও সাফল্য আসবে না, এটা তো আমাদের হাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ কখনও এ ধর্মকে নষ্ট হতে দেবেন না এবং যতদিন এ পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয় তিনি এটাকে ছেড়ে দিবেন না। ... এখন কুরআন মাজীদ বর্তমান আছে। অনেক হাফেযে কুরআন ও (কুরআন যাদের মুখস্থ) আছে। এখন দেখেন যে, কুফ্‌ফার (অস্বীকারকারীরা) কেমন দাবী করেছিল যে, এ ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আমরা এর সমাপ্তি করে দেব। তাদের বিপরীতে কুরআন মজীদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই এর বিলুপ্তি সম্ভব নয়। এ তো একটি বড় মহীরূহ হয়ে যাবে। অনেক বাদশাহ্‌ও এ ধর্মে আসবে" (জঙ্গে মুকাদ্দাস রূয়েদাদ, ৫ জুন, ১৮৯৩ইং)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন,

"আল্লাহ্‌তাআলা আজকের কল্যাণময় যুগে চেয়েছেন যে, তাঁর জালাল প্রকাশ হোক (প্রতাপ)। অতএব কেউ একে বাধা দিতে পারবে না। যেমন সাহাবায়ে কেরামের যুগে চারটি গুণেরই বিকাশ ঘটেছিল তেমনই আজকের এ যুগেও ঘটবে। এখন রবুবীয়তের যুগ। বিরোধীরা শিশুকে পৃথক করে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তা চান না। তাঁর রাবুবিয়্যত (সিফতে রব্ব) চায় যে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকুক। মৌলভী বলে যারা নিজের নিজের পরিচয় দেয়, তারা আল্লাহ্‌র নূরকে নিবিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর এ নূরের পূর্ণ বিকাশ চান এবং এমনই হবে যেমন তিনি চেয়েছেন" (মলফূযাত; ২য় খন্ড; পৃঃ ১৯২)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন, এসব লোকদের একমাত্র ইচ্ছা এই যে, তারা আল্লাহ্‌র নূরকে মুখের ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিবে। কিন্তু এ নূর নিবে যেতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ নিজ হাতে একে উজ্জ্বল করে জ্বেলে দিয়েছেন। জানি না, আমাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে তারা কেন এত কষ্ট স্বীকার করছে! আকাশের নীচে আমার মত ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত আর কেউ আছে কি, যে আমাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়? যদি থাকে তবে সে কেন আমার বিরুদ্ধে মাঠে নামে না? স্ত্রীলোকদের মত শুধু কথা বানাতে কে না পারে? সর্বদা নির্লজ্জ বিরোধীরা এমনই করে আসছে। কিন্তু আমি যেমন ময়দানে নেমেছি; দাঁড়িয়ে আছি, আমার সাথে ত্রিশ হাজার বুদ্ধিমান উলামায়ে কেরাম দরবেশগণ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের একটি জামাত আছে। বৃষ্টির মত ঐশীনিদর্শনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় কেবল মুখের ফুৎকারে এ জামাত ধ্বংস হয়ে যাবে? কখনও তা হতে পারে না। তারাই ধ্বংস হবে যারা আল্লাহ্‌র এ ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করতে চায়" (তাহ্‌ফায়ে গোলড়বীয়া, রূহানী খাযায়েন ১৭ খন্ড; পৃঃ ১৮০-১৮১)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

"যদি এ জামাত, এ ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে না হোত তবে এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতাপ্রাপ্ত হোত না এবং আমিও ঐভাবেই ধ্বংস হয়ে যেতাম যেভাবে মিথ্যাদাবীকারকরা ধ্বংস হয়ে যায়। তোমরা দেখছ যে, কত দ্রুত আমার জামাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। শত্রুরা আল্লাহ্‌র নূরকে নিবাতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। কিন্তু আল্লাহ্‌র নূর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তারা ঐ নূরের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গর্তে প্রবেশ করেছে। তারা জেনে-শুনেও বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে নি।

এসব ঘটনা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা সম্ভব? তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা লজ্জা বোধ কর না? চিন্তা-ভাবনা কর না, বিবেক খাটাও না!' তোমরা ভগ্ন অস্ত্র ও হাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সংগ্রাম করবে? তোমরা যা করছ তার ফলে তোমরাই ধ্বংস হও।"

[তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতায়ন, রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড; পৃঃ ৮৬)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"তারা যেন স্মরণ রাখে যে, তাদের শত্রুতার ফলে ইসলামের সামান্যতম ক্ষতিও সাধিত হবে না। পোকা মাকড়ের / কীটপতঙ্গের মত তারা নিজেরাই মরে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামের নূর প্রতিনিয়ত ব্যাপকতা, প্রসার এবং প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকবে। আল্লাহ্‌তাআলা ইচ্ছা করেছেন, ইসলামের নূরকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিবেন। ইসলামের কল্যাণসমূহ এখন মন্দ প্রকৃতির মৌলবীদের বকবকানীতে বন্ধ হয়ে যাবে না। আল্লাহ্‌তাআলা আমাকে স্পষ্ট ভাষায় সম্বোধন করে বলেছেন, "আমি অনেক বেশি দরজা উন্মুক্তকারী, তোমার জন্য আমি দরজা উন্মুক্ত করব। তুমি আশ্চর্যজনকভাবে সাহায্য পেতে দেখবে এবং তারা আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হবে।"

এ ইলহাম এবং আরো একটি ইলহাম বারবার নাযেল হয়েছে। সামান্য পার্থক্যের সাথে ইলহাম হয়েছে; "আমি তোমাকে সম্মান দেব এবং তোমাকে (জামাতকে) অনেক বেশি বৃদ্ধি করে দেব। তোমার প্রভাব ও প্রতিপত্তিতেও বরকত রেখে দেব, এত বেশি যে, বাদশাহ্‌রাও তোমার কাপড় হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।"

সুতরাং হে কৃপণ প্রকৃতির মৌলভীরা! যদি ক্ষমতা থাকে তবে আল্লাহ্ প্রদত্ত আমার এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে অবাস্তব করে দেখাও। সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে দেখ, কোন রকম চেষ্টার ত্রুটি রেখ না। তারপর দেখ আল্লাহ্‌র হাত বিজয় লাভ করে না তোমাদের" (তবলীগে রেসালাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯২)।

আরো কতিপয় এলহাম ঃ (আরবী থেকে অনুবাদ) (১৮৮৩ইং) "তারা আল্লাহ্‌র নূরকে নিবিয়ে ফেলতে চায়। তুমি বল, আল্লাহ্ উহার হেফাযত করবেন। আল্লাহ্‌র সমর্থন তোমাকেও হেফাযত করবেন। আমরাই অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই হেফাযতকারী। আল্লাহ্‌ই উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনি সকল দয়াবানদের চেয়ে বেশি দয়াবান" (তাযকিরাহ্; পৃঃ ১০৭)।

১৮৯৩ইং এর এলহাম ঃ (আরবী থেকে অনুবাদ)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম বানিয়েছেন। তুমি বল, "এ তো আমার প্রভুর অনুগ্রহ। আমি তো নিজেকে সকল প্রকার উপাধি থেকে পৃথক করে রাখি। আমি তো মুসলমানদেরই একজন। তারা চায় যে, আল্লাহ্‌র নূরকে তাঁদের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তার নূরকে পূর্ণতা দান করবেন এবং তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন। আমরা আকাশ থেকে তোমার উপর নিদর্শনাবলী নাযেল করতে চাই এবং শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাই। আল্লাহ্, যিনি রহমান তাঁর নির্দেশ তাঁর খলীফার পুণ্য, যার রাজত্ব ঐশী রাজত্ব" (তাযকিরাহ্, ২৪০ পৃঃ)।

১৯ অক্টোবর, ১৯০২ইং তারিখের এলহাম ঃ

"তারা তোমার নূরকে নিবিয়ে দিতে চায়। তারা তোমার সম্মান হানী করতে চায়। --- আমি তোমার সাথেই আছি এবং তোমার পরিবারবর্গের সাথে" [বদর পত্রিকা, ১ম খন্ড; নং ২; ৭ নভেম্বর ১৯০২; পৃঃ ১০]

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ তিনিই, যিনি সূর্যকে প্রখর জ্যোতি-বিশিষ্ট এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ কিরণবিশিষ্ট করেছেন এবং এর মনযিলসমূহ নির্ধারণ করেছেন যেন তোমরা বৎসরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ্ একে অবশ্যই যথাযথরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এ সমস্ত আয়াত জ্ঞানবান জাতির জন্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন (সূরাতু ইউনুস ঃ ৬)।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ নিদ্রা যান না, নিদ্রা যাওয়া তাঁর জন্য শোভনীয়ও হয় না। তিনি তাঁর ন্যায়-বিচারের পাল্লাকে কখনও নীচু করেন কখনও উঁচু করেন। রাতে মানুষ যেসব কর্ম করে তার সেসব কর্ম তার দিনের কৃতকর্মের পূর্বেই আল্লাহ্‌র হুযূরে পেশ করা হয়। আর যেসব কাজ সে দিনে করে তার রাতের কাজের পূর্বেই পেশ হয়। আল্লাহ্‌র নূর আল্লাহ্‌র পর্দা। যদি তিনি তাঁর এক পর্দা সরিয়ে ফেলেন তবে তাঁর চেহারার নূর ও জ্যোতির্বিকাশ তাঁর প্রতাপ তাঁর মহিমা যতদূর পর্যন্ত যাবে ততদূর সমস্ত কিছুকে জ্বালিয়ে দিবে" (ইবনে মা'জা কিতাবুল মুকাদ্দামা)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে তুমিই প্রতিষ্ঠিত করেছে। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুই প্রতিপালক তুমিই। সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। আকাশসমূহও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে এসব তোমারই নূর। তুমিই একমাত্র সত্য। তোমার কথাই সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য। তোমার সামনে সকলকে হাজির হতে হবে এ-ও সত্য। জান্নাত অবশ্যই সত্য, জাহান্নামও সত্য এবং কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এটাও সত্য। হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার আনুগত্য স্বীকার করছি। তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি, তোমার উপর ভরসা করছি, সমস্ত ঝগড়া-বিবাদ তোমার সামনে পেশ করছি। তোমার কাছ থেকেই সিদ্ধান্ত চাচ্ছি। তুমি আমার ভবিষ্যতের সমস্ত পাপ, অতীতের সমস্ত পাপ, আমার গোপন বা প্রকাশিত সমস্ত পাপের ক্ষমা করে দাও। আমার সকল পাপ যা আমার নিজেরও জানা নেই, তুমিই কেবল জান (সব ক্ষমা কর।) তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই (বুখারী-কিতাবুত্ তাওহীদ)।

তাজুল উরুসে লেখা আছে, আল্লামা যমখশরী বলেছেন, 'জিয়া' শব্দের মধ্যে নূরের চেয়ে বেশি উত্তাপ ও উজ্জ্বলতা আছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ **জায়ালাশ্ শামসা জিয়ায়াঁউ ওয়াল ক্বমারা নূরান"**। (অর্থ ঃ) আল্লাহ্ সূর্যকে আলোর উৎস বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে নূরের। এটা বলা হয়েছে, জিয়া নিজস্ব আলোকে এবং নূর অন্য থেকে প্রতিফলিত আলোকে বলা হয়" (তাজুল উরূস)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

আল্লাহ্‌তাআলা প্রথম থেকেই ইচ্ছা করেছেন যে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যেমন গাছ-পালা, পাথর ইত্যাদি, পশু-পাখী, এমন কি গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কেও তাঁর ইচ্ছা ছিল এই যে, পরস্পর পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বিরাজমান থাকুক। কেউ তো কল্যাণ বিতরণ করবে আর কেউ গ্রহণ করবে। তাই তিনি মানব জাতির মধ্যে এমন সৃষ্টি করেছেন। এক শ্রেণী যারা কল্যাণ বিতরণ করবে আর এক শ্রেণী যারা গ্রহণ করবে। প্রথম শ্রেণীর যারা তাদের যোগ্যতা বেশ তাদেরকে সূর্যের ন্যায় নিজস্ব আলো প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা সূর্য থেকে আলো লাভ করে কোন মাধ্যম দিয়ে। তাদের নিজের আলো নেই বা মাধ্যম ছাড়া লাভ করতেও পারে না। এ দু'শ্রেণীর জন্য সূর্য ও চন্দ্রের উদাহরণ খুবই যথার্থ। কুরআন শরীফের আয়াত **ওয়াশ্‌শাম্‌সে ওয়ায যোহাহা ওয়াল ক্বমারে ইযা তালাহা** (অর্থঃ) সূর্যের কসম এর প্রাতঃকালীন কিরণের; চন্দ্রের কসম যখন এ (সূর্যের) অনুগমন করে; (সূরাতুশ্ শামস্)

এর মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ সূর্য না হলে চন্দ্রের কোন অস্তিত্বই থাকত না। অনুরূপভাবে যদি আম্বিয়া (আঃ) যারা পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মা, না থাকতেন তবে আউলিয়ায়ে কেরামের অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকত না। কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না, অসম্ভব! প্রকৃতির এ বিধান তো চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে (সৎবচন; রূহানী খাযায়েন; ১০ম খন্ড; পৃঃ ১৮৯)।

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

অনুবাদ ঃ আলীফ লাম রা। এটি কামেল কিতাব; যা আমরা তোমার প্রতি এজন্য নাযেল করেছি যেন তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকার রাশি হতে বের করে আলোর দিকে আন, (অর্থাৎ) মহা পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় সত্তার পথে (সূরাতু ইব্রাহীম ঃ ২)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "নিশ্চয় কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি আহ্বান। এর আহ্বান থেকে যতদূর সম্ভব মঙ্গল লাভ কর। নিশ্চয় কুরআন আল্লাহ্‌র রজ্জু ও সুস্পষ্ট আলোকবর্তিকা এবং লাভজনক চিকিৎসা এবং নিরাপত্তার উপায় যে একে শক্ত করে ধরে এবং তার জন্য মুক্তির উপায়, যে এর আনুগত্য করে। এমন ব্যক্তি সৎপথ হতে সরে যায় না যার ফলে পরে তাকে ক্ষমা চাইতে হয়। আর না সে এমন বক্রতা অবলম্বন করে যার ফলে তাকে সোজা করার প্রয়োজন হয়। কুরআন করীমের নতুনত্ব কখনও শেষ হয় না, এর পাঠক কখনও পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয় না। সুতরাং তোমরা একে পড়তে থাক। কারণ আল্লাহ্ এর প্রত্যেকটি অক্ষরে দশ

দশটি পুণ্য দান করেন। আমি একথা বলছি না যে, "আলীফ লাম মীম" একটি অক্ষর। বরং আলীফ এর জন্য দশ, লাম এর জন্য দশ এবং মীম এর জন্য দশটি পুণ্য লাভ হয়" (সুনান আদ্‌দ রেমী; ফায়াযেলুল কুরআন)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন,

"এখানে আঁ হযরত (সঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি মানুষকে অন্ধকার হতে নূরের দিকে নিয়ে আসেন। এ থেকে জানা গেল যে মানুষের জন্য এমন সময় আসে যখন আঁ হযরত (সঃ)-এর বক্তৃতা মানুষকে অন্ধকার হতে নূরের দিকে নিয়ে আসে। কিন্তু সূরা বাকারার ২৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা ঈমান আনে, তিনি তাদেরকে অন্ধকাররাশি হতে বের করে আলোর দিকে আনেন। তথা আঁ হযরত (সঃ) সম্পর্কে ঐ কথাই বলা হয়েছে যা স্বয়ং আল্লাহ্ নিজের সম্পর্কেও বলেছেন। কথাটি বিবেচনার দাবী রাখে ... আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে মানুষ আসত, তাঁর (সঃ)-এর কথা শুনত, আস্তে আস্তে তাদের অন্তরে হুযূর (সঃ) সব কথা প্রভাব সৃষ্টি করত। এভাবে তারা ইসলামের ওপরে ঈমান লাভ করত এবং বহু অন্ধকার থেকে বেরিয়ে নূরের জগতে এসে যেত। তাদের প্রথম অন্ধকার তো ছিল মজলিস যা ছেড়ে তারা আঁ হযরত (সঃ)-এর মজলিসে এসেছিল" (খুতবাতে নূর, পৃঃ ৪৪৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন, "এই আমাদের কিতাব, যাকে আমরা তোমার উপর এজন্য নাযেল করেছি যেন তুমি মানুষকে সকল প্রকার অন্ধকার থেকে আলোর মাঝে নিয়ে আস।" এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের অন্তরে বহু রকমের সন্দেহ এবং মন্দ চিন্তা জাগে। আর ঐ সমস্ত সন্দেহ আশঙ্কা কুরআন পড়ে দূর করা যায় এবং সকল প্রকার রুগ্ন চিন্তা-ভাবনাকে কুরআন দূর করে দেয় এবং পুরোপুরি ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের নূর প্রদান করে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য যে ধরনের বিশ্বাস, ঐশী জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন তা সব এর মধ্য পাওয়া যায়।"

[বারাহীনে আহমদীয়া, ৩য় খন্ড; ২০৫; হাশিয়া নং ১১)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন,

আঁ হযরত (সঃ)-এর কল্যাণময় সত্তার মাঝে অনেক প্রকার নূর একত্র হয়েছিল। তারপর তাঁর (সঃ) নূরের উপর আর একটি নূর আকাশ থেকে ওহী আকারে নাযেল হয়েছিল। এ ঐশী নূর নাযেলের ফলে হুযূর খাতামুল আম্বিয়া (সঃ) বিশাল নূরের সমষ্টি হয়ে গেলেন। অতএব এখানে ইঙ্গিত আছে যে, নূর নাযেল হবার ফিলসফি বা দর্শন (নীতি) এই যে, নূর সর্বদা নূরের উপরেই নাযেল হয়, অন্ধকারের উপর নাযেল হয় না। কারণ মঙ্গল বা কল্যাণের শর্ত আছে এবং অন্ধকারের ও নূরের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু নূরের সাথে নূরের সামঞ্জস্য আছে। আল্লাহ্‌তাআলা যিনি বড়ই প্রজ্ঞাবান তিনি সামঞ্জস্য ও যথার্থতা ছাড়া কোন কিছু করেন না। অনুরূপভাবে নূরের প্রবাহ জারী হওয়ার জন্যও ঐ আইন প্রযোজ্য। যার কাছে কিছু নূর আছে তাকে আরো দেয়া যায়। যার কাছে তাকে দেয়া যায় না। যে ব্যক্তির চোখে (দেখার ক্ষমতা) নূর আছে সে সূর্যের আলো উপভোগ করে। যার চোখে নূর নেই সে সূর্যের আলো থেকে কিছু পায় না। যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক নূর স্বল্প পেয়েছে সে দ্বিতীয় নূরও অল্পই পাবে। যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক নূর বেশি পেয়েছে সে দ্বিতীয় নূরও বেশি পাবে।

আম্বিয়া (আঃ) এমন ব্যক্তিবর্গ যাঁরা প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক নূর পেয়েছেন এবং তারা পূর্ণ ও প্রচুর আধ্যাত্মিক নূর পেয়েছেন। এমনই যেমন তারা পুরোপুরি নূর হয়ে গেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন শরীফে আঁ হযরত (সঃ)-কে নূর এবং 'সিরাজে মুনীর" বলা হয়েছে। যেমন ঃ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٦﴾

অনুবাদ ঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নূর এবং কিতাবে মুবীন এসেছে। (সূরাতুল মায়েদা ঃ ১৬ আয়াতাংশ)

وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٧﴾

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপস্বরূপ" (সূরাতুল আহযাব ঃ ৪৭)।

এটাই বিধান যে, ওহী প্রাপ্তির জন্য পুরোপুরি প্রকৃতিগতভাবে পূর্ণমাত্রায় নূর থাকার বিরাট শর্ত রয়েছে। এমন নূর কেবল আম্বিয়া (আঃ) পেয়েছেন এবং কেবল তাঁরাই এমন নূর লাভের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

(বারাহীনে আহমদীয়া ৩য় খন্ড, রূহানী খাযায়েন ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৫; টীকা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌কে ভয় করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র প্রতি পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে। সঠিক অর্থে তাকওয়া অবলম্বন করা, নিজের কাজকর্মকে রেয়াকারী (লোক দেখানো) থেকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করা সম্ভব হয় না যদি না আল্লাহ্‌র প্রতি অটল বিশ্বাস থাকে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর ধন-দৌলত, মান-সম্মান এবং এসবের উপকরণসমূহের উপর অভিশাপ দেয়া, রাজা-বাদশাহ্‌দের নৈকট্যকে প্রত্যাখান করা এবং কেবল আল্লাহ্‌কে সকল কিছুর ভান্ডার মনে করা আল্লাহ্‌র প্রতি কামেল ইয়াকীন [পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস] ব্যতীত কখনই সম্ভব না। এবার বল, হে তোমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দাও! এবার বল যে, তোমরা সন্দেহের অন্ধকার থেকে দৃঢ় ঈমানের নূর পর্যন্ত কীভাবে পৌছুতে পার? দৃঢ় ঈমানের মাধ্যম তো একমাত্র ঐশীবাণী আল্লাহ্‌র কালাম (ইলহাম)! **ইউখরিজুহুম মিনায্ যুলুমাতি ইলান নূরের**-এর [তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন] (নুযূলে মসীহ্ ঃ পৃঃ ৯২)

১৮৯৩ইং সনের একটি ইলহাম

আল্লাহ্‌তাআলার কসম! আল্লাহ্ স্পষ্ট করে সরাসরি আমাকে ইলহাম করে বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) হুবহু অন্য সব মানুষের মতই একজন মানুষ ছিলেন, কোনই পার্থক্য ছিল না। তবে তিনি অবশ্যই আল্লাহ্‌র সত্য নবী ছিলেন, আল্লাহ্ প্রিয় ছিলেন; প্রেরিত ছিলেন। আমাকে তিনি এ কথাও বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ)-কে যা কিছু তিনি দিয়েছিলেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর মাধ্যমে আমাকেও ঐ সবকিছু দিয়েছেন। বলেছেন, "তুমিই মসীহ্ মাওউদ (তুমিই প্রতিশ্রুত মসীহ্) তোমার সাথে নূরানী অস্ত্র রয়েছে যদ্বারা অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করা হবে এবং তুমি ক্রুশ ধ্বংসকারী হবে" (হুজ্জাতুল ইসলাম, পৃঃ ৯)।

১৮৯৬ সনের একটি এলহাম ঃ "আমি নিজের জ্যোতির বিকাশ করব। আমি আমার শক্তির বিকাশের মাধ্যমে তোমাকে ওপরে তুলে আনব এবং তোমার বরকতকে ছড়িয়ে দেব। এতটা যে বাদশাহ্ তোমার পোষাক থেকে বরকত অন্বেষণ করবে" (তাযকিরাহ্, পৃঃ ২৮১)।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন; ২৬ জুলাই, ২০০২ইং হতে অনুবাদ।)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

রোযার বিভিন্ন দিক

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৬ নভেম্বর, ২০০১ইং তারিখ মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয, ও সূরা ফাতিহার পর হুযূর (আইঃ) সূরাতুল বাকারাহ্র ১৮৪, ১৮৫ আয়াত পাঠ করে খুতবা দেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝١٨٤ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝١٨٥

অর্থ ঃ 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্যে রোযা ফরয করা হলো, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যে ফরয করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হ'তে পার'।

'(ফরয রোযা রাখ) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনই মাত্র, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তা হলে (তাকে) অন্য দিন (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; যাদের পক্ষে তা (রোযা রাখা) সাধ্যাতীত তাদের জন্য ফিদিয়া- একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো। অতএব যে কেউ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করে, তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই উত্তম' (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৮৪-১৮৫)।

এখানে বলা হয়েছে যে, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছিল" এ কথা ইতঃপূর্বে কোন ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হয় নি। কুরআন মজীদের সার্বজনীন হওয়ার এটি একটি বড় প্রমাণ। সকল জাতির মধ্যে রোযা ব্রত পালনের বিধান ও প্রথা রয়েছে তা যে ধরনেরই হোক না কেন। অথচ কোন কিতাবে একথা বলা হয় নি যে, অপরাপর জাতির মধ্যেও রোযার প্রচলন রয়েছে। হিন্দুদের মধ্যেও রোযা আছে। বৌদ্ধ ধর্মেও রোযা আছে। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যার মধ্যে কোন না কোন আকারে রোযার প্রচলন নেই। অতএব আল্লাহ্র পবিত্র গ্রন্থ কুরআন অবশ্যই সমস্ত মানব জাতির জন্য নাযিল হয়েছে। যার ফলে এখানে সকল জাতির মধ্যে রোযার প্রচলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থে করা হয় নি।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা ঘোষণা করেছেন, মানুষের অপর সকল কাজ করে তার নিজের জন্য কিন্তু তার রোযা আমার জন্য। আমি স্বয়ং এর পুরস্কার হবো। আল্লাহ্ বলেছেন, 'রোযা ঢালস্বরূপ, অতএব, তোমরা যখন রোযা রাখ, কোন অশালীন কথা বলবে না, না অযথা উচ্চবাচ্য করবে। যদি কেউ গালিও দেয় (তবু গালি দিবে না) বরং বলবে, 'আমি তো রোযা রেখেছি।"

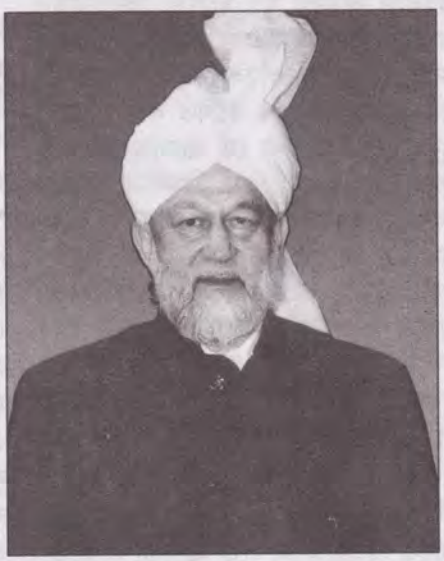

রোযা রেখেও যদি একজন অশালীন বা অভদ্র কথা-বার্তা বলে তবে সে তো কেবল ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া আর কিছু করছে না। আসল কথা এটাই যে, রোযাদার ব্যক্তির খুব সাবধান থাকা উচিত, নিজকে সংযত রাখা উচিত, রাগান্বিত হয়েও অসংযত কথা বলা উচিত নয়। কোন ব্যক্তি তার সাথে খারাপ আচরণ বা ঝগড়ার অবতারণা করলেও সে নিজেকে সংযত রাখবে এবং বলবে, "আমি তো রোযাদার"।

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্র কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের (সঃ) প্রাণ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও সুপ্রিয় ও পবিত্র।" রোযাদারের জন্য দু'টি বড় খুশী নির্ধারিত আছে। প্রথমতঃ যখন সে রোযা ইফতার করে তখন খুব খুশী বোধ করে। দ্বিতীয়তঃ যখন সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন সে খুব খুশী হবে।"

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'আল্লাহ্র কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ খুব সুগন্ধ ও সুপ্রিয়'। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের মত আল্লাহ্ গন্ধ অনুভব করেন। বরং এখানে রোযাদারের মনোবল বৃদ্ধির জন্য, তার সম্মানের জন্য একথা বলা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, রোযা ঢালস্বরূপ যা আগুন হ'তে রক্ষার উপায়। হযরত সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের একটি দরজা আছে যার নাম রাইয়ান, এ দরজাটি কেবল রোযাদারের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে। রোযাদারগণ কেবল এ দরজা দিয়ে প্রবেশাধিকার পাবেন। অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে, রোযাদার কোথায়? তখন রোযাদাররা দাঁড়িয়ে যাবেন। তারপর তাদেরকে ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। অন্য কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।"

এখানে রূপক ভাষায় উপমা দিয়ে কথা বলা হয়েছে। নতুবা বাস্তব বিষয় এই যে, জান্নাতের কোন দরজা নেই। আমরা জানি না আল্লাহ্ জানেন, যারা অন্য ধর্মের রোযাদার তাদের কি হবে। তবে তারা যদি আল্লাহ্ ও পরকালের হিসাব-নিকাশের উপর বিশ্বাস করে থাকে তবে তাদের জন্যও জান্নাতের দরজা খোলা আছে। আমার বিশ্বাস যে, তাদের রোযা গৃহীত হবে।

হযরত আবূ আমামা (রাঃ) একবার আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কোন পথ-নির্দেশনা দিবেন যদ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।' হুযূর (সঃ) বলেছেন, "তোমার জন্য রোযার বিধান রয়েছে। রোযার মত আর কোন কিছু নেই। হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক বস্তুর মধ্য থেকে যাকাত দিতে হয়। শরীরের যাকাত রোযা"।

হুযূর (সঃ) বড়ই হিকমতপূর্ণ কথা বলেছেন, সব কিছু থেকে যাকাত দিতে হয় আর শরীরের যাকাত রোযার মাধ্যমে দেয়া হয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য রোযা রেখে নিজেকে পানাহার থেকে বিরত রাখতে হয়।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, অনেকেই রোযা রেখে কেবল ক্ষুধার্ত থাকে এবং অনেকেই রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে থেকে কেবল অঘুমা থাকে আর কিছু পায় না। রোযা ও তাহাজ্জুদের আসল লক্ষ্যে তারা উপনীত হয় না। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোযা রেখেও মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত হয় না, মিথ্যার উপর আমল করা থেকে বিরত হয় না তার জন্য খামাখা ক্ষুধার্ত ও পিপাসায় কষ্ট পাওয়ার কোন প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নিকট নেই।"

দেখুন এখানে, আজকালকার মৌলভীদের কী অবস্থা! তারা এত বেশী মিথ্যা কথা বলে যে, সম্ভবতঃ অন্য কেউ মিথ্যা বলার প্রতিযোগিতায় তাদের সাথে জিততে পারবে না। অথচ তারা রোযাও থেকেছে! বড়ই আশ্চর্যজনক বিষয় আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "রোযাদার যদি মিথ্যা বলে তবে তার রোযার কোনই উপকারিতা নেই। প্রয়োজনীয়তাও নেই"।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, "রমযান মাসের জন্য কত বড় মূল্যবান শিক্ষা যে, একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসের কারণে কত বড় বড় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজের উপর রোযাকে কার্যকর করে। তার নিজের প্রয়োজনকে পরিত্যাগ করে রাখে। কুরআন শরীফে রোযার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, হে ঈমানদারগণ! রোযা তোমাদের জন্য এ উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বনে অভ্যস্ত হয়ে পড়।" একজন রোযাদার নিজের হালাল বিষয়াদি থেকে নিজেকে বিরত রাখে কেবল আল্লাহ্‌র অনুমতি না থাকার কারণে। এমতাবস্থায় কীভাবে সম্ভব হ'তে পারে যে, পরবর্তীতে ঐ একই ব্যক্তি ওসব বস্তুকে লাভ করতে চেষ্টা করবে যা আল্লাহ্ তার জন্য কখনই হালাল করেন নি। হারাম বস্তুকে পেতে চেষ্টা করবে। অন্যায়ভাবে নফসের তাড়নার বশবর্তী হবে।"

বাস্তবে আমরা দেখি, মানুষ তা সে যেমনই হোক রমযান মাসে রোযা রাখে। কিন্তু রমযানের পরে আবার ঐসব অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে রমযানে যেসব অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত থাকার অভ্যাস করেছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরো লিখেছেন, "সবশেষে তাকওয়া অবলম্বনের সেই শ্রেষ্ঠ পন্থা যার নাম রোযা। রোযার মধ্যে মানুষ অনেক ন্যায্য গ্রহণযোগ্য প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে নিজেকে সুনির্দিষ্ট সময়ে বিরত থাকে। রোযার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট না করে। বলা হয়েছে **'লায়াল্লাকুম তাত্তাকূন'** - যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।" দেখুন, রোযায় যখন যায়েয জিনিস থেকে বিরত থাকবেন তখন রোযার পর আপনি কি নাজায়েয বস্তুকে সংগ্রহ করবেন?

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, **ফিদইয়াতুন তাআমু মিস্‌কীন**- এক মিসকীনকে খাবার দেয়া। এখানে সদকাতুল ফিতর (ফিতরানা)-এর পরিমাপের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। সুন্নত থেকে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক রোযাদার ঈদুল ফিতর-এর পূর্বে ফিতরানা আদায় করেন। বুযূর্গানে দীনের আচরণ থেকে প্রমাণিত যে, নিজে রোযা রাখ আর নিজের খাদ্য-সামগ্রী গরীবদেরকে খাইয়ে দাও। আমার নিজেরও পসন্দ এটাই। এটা হয়ত সকলের জন্য সম্ভব হবে না। কিন্তু ফিতরানা সকলের জন্য একান্ত জরুরী। ফিতরানার টাকা ঈদের পূর্বে দিয়ে দেয়া উচিত যেন গরীবদের মধ্যে যথা সময়ে বিতরণ করা যায়।

আরবী ভাষার নিয়ম মতে আলোচ্য আয়াতের অংশ **আল্লাযীনা ইউতিকুনাহু ফিদইয়াতুন তাআমু মিসকীন**-এর অর্থ হ'তে পারে "যারা ক্ষমতা রাখে" এবং এ অর্থও হ'তে পারে "যারা ক্ষমতা রাখে না।" এর দ্বারা যা জানা গেল তা এই যে, যারা ফিদিয়া দেবার ক্ষমতা রাখে তারা ফিদিয়া দিবে এবং "যারা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না তারা ফিদিয়া দিবে।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) লিখেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখে রোযা রাখতেন। কোন কারণে এদিনগুলোতে রোযা রাখা সম্ভব না হলে ফিদিয়া দিতেন। এ দিনগুলোকে "আইয়ামে বিয" বলা হতো। রমযান মাসে তো "আঁ হযরত (সঃ) অনেক বেশী সদকা খয়রাত করতেন"।

হযরত খলীফাতুল আওওয়াল (রাঃ) লিখেছেন, "রমযান মাসে অনেক বেশি দোয়া এবং কুরআন শরীফের দরস হওয়া উচিত।" আমাদের জামাতে সর্বত্র দরসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এবার ও আমি সপ্তাহে দু'দিন এবং বাকী দিনে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম কুরআনের দরস দিবেন। দোয়া করবেন আল্লাহ্ আমাদেরকে তৌফীক দান করুন।

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও নিজের আত্মশুদ্ধির রোযা রাখে এবং রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে তার পূর্বের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়। ক্ষমা হয়ে যায়।"

দুঃখজনক এই যে, অনেকে মনে করেন রোযার মাসে টাকা খরচ অনেক বেশি হয়ে যায়। প্রকৃত সত্য এই যে, তারা রোযার মাহাত্ম্য সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নয়। তাদের কথা সঠিক নয় তারা সেহরী এত বেশী খেয়ে ফেলে যে, দুপুর পর্যন্ত হজম হয় না বার বার ঢেকুর আসতে থাকে। যখন সকালের খাবার বিকালে হজম হয় তখন আবার ইফতারীর পর তারা প্রচুর খেয়ে নেয়। এত বেশী খেয়ে নেয় যে, কেবল আলস্য ও ঘুম ঘুমভাব হ'তে থাকে। কখনও চিন্তা করে না যে, রোযা তো একটা নফস তথা কুরিপুর বিরুদ্ধে মুজাহাদা (সংগ্রাম) ছিল। এটার উদ্দেশ্য ছিল না যে, বেশি বেশি খরচ করে প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হবে। স্মরণ রাখবেন যে, রোযার মাসে কুরআন মজীদ নাযিল হ'তে আরম্ভ হয়েছিল। এর মধ্যে হেদায়াত ও নূর রয়েছে। সুতরাং কুরআনী হেদায়াত ও নূরের উপর চর্চা ও কর্মকান্ডের ভিত্তি হওয়া উচিত। রোযার মাধ্যমে সময় হাতে পাওয়া যায় কাজ-কর্মের মধ্যে এক ধরনের অবসর পাওয়া যায়। অতএব এর সদ্ব্যবহার হওয়া উচিত। আরাম তো হয় মরণের পরে, নয় তো পুণ্য কর্মে বা পাপমোচনে লাভ করা যেতে পারে। অতএব রোযার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ হয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইফতারী খাওয়ানোর মাধ্যমে পুণ্য বা সওয়াব লাভ হয়। অতএব ইফতারীর দাওয়াতের প্রচলন আছে। কিন্তু খুব অনাড়ম্বর দাওয়াত হওয়া উচিত। অনেক বড় আয়োজন করে খরচ বাড়ানো উচিত নয়। হ্যাঁ, অনাড়ম্বর দাওয়াত করে পুণ্য হাসিল করা যেতে পারে। আর নিমন্ত্রিতদের খুব বেশি খাবার খাইয়ে তাদের পেট বেশি ভর্তি করার গুনাহ্‌ও হবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) একথাও বলেছেন, "যারা রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না তাদেরও আল্লাহ্ ক্ষমতা দিতে পারেন রোযার মাধ্যমে"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "এ দিন মোবারক দিন আবার মোবারেক দিনও।" অর্থাৎ বরকতওয়ালা দিন, আল্লাহ্ যে দিনে বরকত রেখেছেন। আর এদিন মানুষকে বরকতমন্ডিত করে। মানুষের উচিত রোযার মাধ্যমে অনেক বেশি আল্লাহ্র নির্দেশিত পথ অবলম্বন করা। রোযার সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছে, **আন তাসুমূ খায়রুল লাকুম**। অর্থাৎ তোমরা যদি রোযা রাখ তবে তা ভাল হবে। এখানে সম্ভবতঃ নফল রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে। কারণ **কুতিবা আলায়কুম** তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। অতএব এখানে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে যে, যদি নফল রোযাও রাখ তবে খুবই ভাল।

মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে কিছু হাদীস পড়ছি। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "সেহরী খাবে তোমরা কারণ সেহরী খাওয়াতে বরকত আছে।" আমাদের সমাজে তো ছোটাদেরও সেহরী খাওয়ার প্রচলন আছে। যারা রোযা রাখে না ছোট, তারাও সেহরী খায়। এভাবে সকালে উঠার অভ্যাস হয়ে যায়।

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন সেহরী খাও তখন খাওয়া শেষ হবার পূর্বেই যদি আযান হয়ে যায় তবে আযান আরম্ভের সাথে সাথেই খাবার পরিত্যাগ করবে না বরং খাওয়া শেষ কর। অর্থাৎ সেহরী খেতে খেতে আযান শুনে তাড়াতাড়ি অর্ধেক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেয়া জরুরী নয়। এমন কথা নয় যে, তাড়াতাড়ি গিয়ে জামাতের নামাযে শামিল হ'তেই হবে। বরং পুরো খাবার খেয়ে শেষ করবে নামাযে দেরী হলেও। কারণ যে ক্ষুধার্ত তার ক্ষুধা থাকলে নামাযে মনোযোগ হবে না। অতএব খাবার পুরো খেয়ে শেষ করবে। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সঃ) খাওয়া শেষ হবার পূর্বে আযান হয়ে গেলে অনেক সময় হাতের খাবার হাতে নিয়েই চলতে চলতেও খেয়েছেন। এখান থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও খাবার খাওয়া যেতে পারে। এ জন্য আমাদের এখানে কোন কারণে কোন কোন দাওয়াতে দাঁড়িয়ে খাবার ব্যবস্থা করা হয়। এমন করা জায়েয। অনেকে মনে করেন যে, কোন অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া যাবে না। আঁ হযরত (সঃ) যে, শরীয়ত আমাদের দিয়েছেন আমরা তা পালন করতে দ্বিধাবোধ করি না।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যদি কেউ রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে ফেলে সে যেন রোযা না ভাঙ্গে বরং রোযা পুরা করে। কারণ ধরে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ তাকে খাইয়েছেন। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তার রোযা সম্পূর্ণ হয়েছে।

অনেকে মনে করে যে, খেতে কেউ যদি দেখে ফেলে তবে রোযা ভঙ্গ হয়। একবার একটি মেয়ে লুকিয়ে কিছু খাচ্ছিল। তার ভাই বা কেউ দেখে ফেললে ঐ মেয়েটি বলে উঠল, "তুমি তো রোযা ভেঙ্গে দিলে?" অর্থাৎ মেয়েটি মনে করত যে, কেউ দেখলে রোযা ভঙ্গ হয় নতুবা হয় না। অথচ এ কথা ঠিক নয়। আল্লাহ্ তো সব দেখেছেন। জেনে-শুনে কিছু খেলে রোযা অবশ্যই ভঙ্গ হয়। ভুল করে কিছু খেলে ভঙ্গ হয় না।

হযরত সাহ্ল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "মানুষ ততদিন মঙ্গলমত দিনাতিপাত করবে যতদিন তাড়াতাড়ি ইফতারী করবে।" অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতারী করবে। খামাখা দেরী করবে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত। সাধারণতঃ শিয়া মতাবলম্বীরা দেরী করে ইফতার করে। তারা মনে করে যে, দেরী করে ইফতারী করলে ভাল। অথচ আঁ হযরত (সঃ) সময় হওয়ার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে ইফতারী করতেন। অতএব ইফতারীতে দেরী করা জায়েয নয়। এখানে আল্লাহ্র ইচ্ছাকে মূল্য দেয়ার প্রশ্ন রয়েছে। যেই সময় হয়েছে সাথে সাথে ইফতারী কর কারণ আল্লাহ্র অনুমতি হয়েছে।

কোন সময় হয়ত মেঘের কারণে যদি বুঝতে না পারা যায় যে, সময় হয়েছে কিনা সেটি ভিন্ন কথা। যদি এমন হয় যে, মেঘের কারণে ভুলবশতঃ সূর্য অস্ত হয়েছে মনে করে ইফতারী করা হয় তারপর যদি দেখা যায় যে, সূর্য ডুবে নি তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সাথে সাথে ইফতারী খাওয়া বন্ধ করতে হবে। পরে সময় হ'লে আবার ইফতারী করতে হবে।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্রুত রোযা ইফতারী করে সে আল্লাহ্র কাছে বেশি প্রিয়।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) একবার যাত্রা পথে একস্থানে মানুষের ভীড়ের মধ্যে দেখলেন, এক ব্যক্তির মাথার উপর ছায়া করে রাখা হয়েছে। আঁ হযরত (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? বলা হোল, এ ব্যক্তি রোযাদার। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, সফর কালে (যাত্রা পথে) রোযা রাখার মধ্যে কোন পুণ্য নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও অনুরূপ আমল করেছেন। অনেক সময় রোযার মাসে রোযা অবস্থায় কেউ কেউ দূর থেকে সফর করে কাদিয়ান এসেছেন এবং প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাদেরকে কিছু আপ্যায়নের জন্য পেশ করতেন। তারা বলতেন, 'আমরা তো রোযাদার'! হুযূর (আঃ) বলতেন, কোন কথা নেই খেয়ে নাও, কারণ সফরে তো রোযা হয় না। আল্লাহ্তাআলার নির্দেশের বিরুদ্ধে রোযা কি করে হ'তে পারে! অতএব সফরে রোযা রাখা উচিত নয়।

আজকাল প্রশ্ন করা হয় যে, আজকাল সফর তো খুব সহজ! বিমানে বা আরামদায়ক গাড়ীর সফর। এতে রোযা রাখতে সমস্যা হয় না। মনে রাখতে হবে, এ সমস্ত সফরও সফর বলেই গণ্য হবে। যখন কেউ সফর আরম্ভ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে তখনই সফর আরম্ভ হয়ে যায়। তা বিমানে বা অন্য কিছু হোক। আল্লাহ্ কি জানতেন না যে, এ যুগে বিমান চলাচল করবে আর খুব কম সময়ে অনেক দূর দূরান্তে যাওয়া যাবে? অতএব রোযা রাখতে বাধা নেই। আল্লাহ্ খুব জানতেন। কুরআন শরীফে সবই উল্লেখ আছে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে। আঁ হযরত (সঃ)-এর বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযোগ যে, তিনি আজকের সফরের খবর জানতেন না। সফর ছোট বা যেমনই কেউ নিজ শহর বা গ্রামের বাইরে চলে আসে সফরের উদ্দেশ্যে তখনই সে মুসাফির বা পথিক বলেই গণ্য হবে। সাহাবায়ে কেরাম এমনই করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম যখন ফেরত আসতেন তখন শহরে প্রবেশের পূর্বে বিশ্রাম করে কিছু খাওয়া-দাওয়াও করতেন। তারপর শহরে প্রবেশ করতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, রোযা রাখা অবস্থায় দাঁত মাজা, ব্রাশ করা বা দাঁতন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা রোযাদারদের জন্য সুন্নত। অনুরূপভাবে হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) হুযূর (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তেল এবং সুগন্ধ বা আতর ব্যবহার করাও উত্তম ও উপহারস্বরূপ'।

মানুষ অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতেন অনেক সময়। একবার এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে জানতে চেয়েছেন, রোযাদার ব্যক্তির জন্য আয়না দেখা জায়েয হবে কি না? হযরত (আঃ) বলেছেন, জায়েয। অন্য একজন জিজ্ঞেস করেছেন, রোযাদার রোযা অবস্থায় মাথার চুলে তেল লাগাতে পারে কি না? হযরত (আঃ) বলেছেন, হ্যাঁ, আগের দিনে মানুষ মাথায় তেল লাগাত। আজকাল কম হয়ে গেছে। আর একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, রোযাদার সুগন্ধি ও আতর ব্যবহার করতে পারে কি না? হুযূর (আঃ) বলেছেন, "হ্যাঁ" আর একটি প্রশ্ন হয়েছিল রোযা রেখে চোখে সুরমা লাগানো যায় কি না? হুযূর (আঃ) বলেছেন, মাকরূহ বা পসন্দনীয় নয়। দিনে না লাগিয়ে রাতে সুরমা লাগাতে পারে। প্রশ্নগুলো দেখুন কী অদ্ভুত ধরনের। আগের দিনে সুরমা লাগাবার খুব প্রচলন ছিল।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ 'রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন নাযেল করা হয়েছে যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং (যাতে রয়েছে) হেদায়াতের সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ ও 'ফুরকান' (সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী নিদর্শনসমূহ); অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেউ অসুস্থ অথবা সফরে থাকে, তাকে অন্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না, এবং (চান) যেন তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করতে পার এবং তিনি যে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন সে জন্যে তোমরা যেন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

(সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৮৬)

এখানে বলা হয়েছে **শাহ্রু রামাযানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআনু**-রমযান সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। অপর একটি অর্থ হয়, রমযান সম্পর্কে কুরআন শরীফে বিশেষভাবে আয়াত নাযিল হয়েছে।

ফামান শাহিদা মিনকুমুশ্ শাহ্রা অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ রমযান মাসকে পায় অর্থাৎ রমযান মাসের চাঁদ দেখে।

আগামীকাল থেকে আমাদের রমযান আরম্ভ হচ্ছে। আজকাল এমন সুনির্দিষ্ট হিসাব পদ্ধতি বেরিয়েছে যে, পূর্বের থেকেই সুনিশ্চিতভাবে হিসাব করে জানা যায় যে, কবে চাঁদ উঠবে। যেমন আজ সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ উঠবে, ইনশাআল্লাহ্।

আরো বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে (রমযান মাসে) তবে সে সুস্থ হয়ে পরে অন্য কোন সুবিধাজনক সময়ে রোযা রাখবে।' এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি বড় ধরনের সুবিধা দেয়া হয়েছে যে, গরমের বড় কঠিন দিনের রোযা অসুস্থতার কারণে কেউ রাখতে পারে নি, সে রমযান মাস পেলেও কোন গরমের দিনেই ঐ রোযা রেখে পূরণ করবে বা সে নিজের সুবিধাজনক সময়ে অর্থাৎ ছোট দিনে, শীতের দিনেও রোযা রেখে রমযানের রোযা পূরণ করতে পারবে। কিন্তু সে যেন সামান্য অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে রোযা পরিত্যাগকারী না হয়। বরং প্রকৃতপক্ষেই সে রোযা রাখার ক্ষমতা হারিয়েছিল। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান তোমাদের জন্য তিনি কাঠিন্য চান না।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন (সুনানে নাসায়ী)। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "রমযান মাস তোমাদের জন্য এসেছে যা বড় কল্যাণমন্ডিত মাস। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ মাসের রোযাকে ফরয করেছেন। এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বিদ্রোহী শয়তানদেরকে শিকল পরিয়ে বন্দী করে রাখা হয়।" এখানে বিবেচ্য বিষয় এই যে, রমযান মাসেও তো মানুষ অনেক পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাদের শয়তান তো শিকল পরে বন্দী হয়ে পড়ে না। উত্তর এই যে, এ বার্তা তো কেবল মু'মিনদের জন্য। মু'মিনদের শয়তান অবশ্যই বন্দী হয়েই থাকে। মু'মিন রোযার মাসে অতি সাধারণ পাপও করতে চায় না।

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, রমযান মাসের রাতে যে খায়ের ও বরকত বা কল্যাণ থেকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়ে থাকে সে পৃথিবীর সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) রমযান মাস সম্পর্কে বলেছেন, "অন্য সকল মাসের চেয়ে রযমান উত্তম। যে ব্যক্তি এ মাসে নিজেকে সংশোধন করে এবং শরীয়তের বিধানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খুব বেশি ইবাদত-বন্দেগী করে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেমন সে ভূমিষ্ঠ হবার সময় নিষ্পাপ ছিল।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের জন্য রযমান মাস এসেছে। মু'মিনদের জন্য এর চেয়ে আর কোন মাস উত্তম হয় না এবং মুনাফিকদের জন্য এর চেয়ে খারাপ মাস আর হয় না।"

মু'মিনদের জন্য এ মাস বড়ই কল্যাণ বয়ে আনে। যদিও বাহ্যিকভাবে কঠিন রোদে গরমে রোযা রাখা বড় কষ্টকর হয়। কিন্তু আল্লাহ্র কৃপা রোযাদারদের জন্য ছায়াস্বরূপ হয়ে থাকে। মুনাফিকরা বড় কষ্টে দিন কাটায় যে, কবে রমযান শেষ হবে যখন তারা স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ পাবে।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, (মুসনাদ আহমদ) "ঐ ব্যক্তির নাক মাটিতে পড়ুক যে, আমার নাম শুনেও আমার উদ্দেশ্যে দুরূদ পাঠ করে না। ঐ ব্যক্তির নাকও মাটিতে পড়ুক রযমান এসে অতিবাহিত হোল কিন্তু তার পাপ ক্ষমা হোল না (অর্থাৎ সে পাপ মোচনের চেষ্টা করে নি)। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তির নাকও মাটিতে পড়ুক (অনেক বড় অপমান হোক) যে তার পিতামাতাকে বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছে কিন্তু সে জান্নাতের অনুমতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, (সুনান আদ্দারিমী) "যে ব্যক্তি রমযান মাসের একটি রোযাও বিনা কারণে ছেড়ে দেয় সে পরবর্তীতে জীবন ভর রোযা রেখেও এর যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করতে

সক্ষম হবে না।" সুতরাং অসুস্থতা বা সফর ছাড়াই বিনা কারণে খামাখা রমযানের রোযা পরিত্যাগ করবে কেন? আজকাল অনেক সময় অবহেলা করা হয় যে, চলো আজ রোযা না করলাম পরে পূরণ করা যাবে। এ ধারণা ঠিক নয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, এ ধরনের অবহেলা কখনও করা যাবে না। সারা জীবন রোযা রেখেও এর ক্ষতিপূরণ করা যাবে না। যদি এমন কেউ করে তবে সে সারা জীবন ইস্তিগফার করবে এবং কখনও রোযা ওভাবে পরিত্যাগ করবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, **শাহরু রামযানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআনু**। কুরআন শরীফে এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রথম প্রথম সাধারণ কল্যাণের বা পুণ্যের কথা বলা হয় তারপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ বা রহমত ও পুণ্যের কথা বলা হয়। অনুরূপভাবে প্রথমে সাধারণ মন্দ আমলের কথা বলা হয় তারপর খুব বেশী মন্দ আমলের কথা বলা হয়। যেমন প্রথমে উমরা পালনের উল্লেখ হয়েছে পরে হজ্জের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে সদকা খয়রাতের কথা পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথমে নফল রোযার কথা বলা হয়েছে, তারপর রমযানের রোযার কথা বলা হয়েছে। প্রথমে রমযানের বিভিন্ন রকম নির্দেশ দেয়ার পর কুরআন নাযিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, **'উনযিলা ফিহিল কুরআনু'** রমযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ রমযান মাসে কুরআন নাযিল হতে শুরু হয়েছে (কুরআন ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে)। আমি যতদূর জানতে পেরেছি তা এই যে, হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) যখন হেরা পর্বতের গুহায় বসে ধ্যানমগ্ন থাকতেন তখন সেখানে প্রথম আয়াত নাযিল হয়েছিল সেটা রমযান মাস ছিল।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেন ঃ

"কুরআন শরীফে ফুরকান বলা হয়েছে। আমি কুরআন থেকে জেনেছি যে, ফুরকান এমন বিজয় লাভ হওয়াকে বলা হয় যেখানে শত্রুপক্ষের কোমর ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। বদর যুদ্ধের দিনকে ফুরকান বলা হয়েছে। বদর যুদ্ধের বিজয়ের ঘটনা রমযান মাসে ঘটেছে। অতএব রমযানের মাস জাগতিক বিজয়ের দিক থেকে অথবা কুরআন নাযিল হওয়ার দিক থেকে অথবা কুরআনে এর জন্য জোর তাগিদ করা হয়েছে। সকল দিক থেকে রমযান মাস বড়ই পবিত্র মাস।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে অন্যান্য উম্মতের মতই এ উম্মতের জন্যও বড় কোন আদেশ-নিষেধ না রাখতেন। কিন্তু এখানে তিনি বড় ধরনের আদেশ-নিষেধ মঙ্গলের জন্যই রেখেছেন। আমার মতে যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে বড় খাঁটি অন্তকরণে প্রার্থনা করে, 'হে আল্লাহ্! আমাকে এ বরকতপূর্ণ মাসে বঞ্চিত ক'র না' - আল্লাহ্ তাকে কখনও বঞ্চিত রাখেন না। যদি এমন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থও হয়ে পড়ে তবে তার এ অসুস্থতা তার জন্য রহমতের কারণ হয়ে যায়। কারণ প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক কাজের মূল ভিত্তি তার নিয়্যতের (সদিচ্ছার) উপরে হয়। মু'মিনের উচিত নিজকে, নিজ সত্তাকে আল্লাহ্র রাস্তায় নিবেদিতপ্রাণ প্রমাণ করা। এমন ব্যক্তি যদি রোযা রাখতে অক্ষমও হয়ে পড়ে, তবুও যদি তার অন্তরে বড় আবেগ থাকে যে, হায়! আমি যদি রোযা রাখতে পারতাম। সে রোযা না রাখতে পারায় যদি ক্রন্দনরত থাকে যে হায়, আমি রাখতে চাই, অবশ্যই রোযা রাখতে চাই এবং তার অন্তরে কোন ইচ্ছার ও চেষ্টার অভাব থাকে না, এমন ব্যক্তি যদি রোযা নাও রাখতে পারে তবুও আল্লাহ্ তাকে বঞ্চিত রাখবেন না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

প্রকৃত সত্য এই যে, কুরআন শরীফের যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে সে সুবিধাগুলো উপভোগ করাও তাকওয়ার (অন্তর্ভুক্ত)। আল্লাহ্তাআলা মুসাফির (পথিক, পথযাত্রী)-কে এবং অসুস্থজনকে পরবর্তীকালে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন ...। অতএব এ আদেশের উপরও আমল করা উচিত। আমি পড়েছি, অনেক বড় বড় পুণ্যবান ইমাম এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, যদি কেউ অসুস্থ অবস্থায় এবং সফরে থাকাকালে রোযা পালন করে তবে সে আল্লাহ্র নাফরমানী (আদেশ লঙ্ঘন) করে। ... আঁ হযরত (সঃ) বলতেন, তোমরা যদি মনে কর যে, অনেক বেশী পুণ্য কর্ম করে আল্লাহ্কে ক্লান্ত করবে, তবে কখনও সম্ভব হবে না। তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। অতএব ভাল হয় যদি তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি যতটা সুযোগ-সুবিধা দেন তা-ও সানন্দে গ্রহণ কর এবং যতটা কষ্ট-কাঠিন্য তিনি প্রয়োগ করেন তা-ও সানন্দে গ্রহণ কর। আর একটি উত্তম কথা এই যে, আল্লাহ্র নির্দেশ বা আদেশের সাথে নিজ থেকে সামান্য কিছুও সংযোজন বা বিয়োজন করবে না।

আল্লাহ্তাআলা আদেশ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়েছে অথবা সফর করতে বাধ্য হয়েছে তারা যেন রমযানের পরবর্তী সময়ে ততটা রোযা রাখে যতটা এখন ছুটে গেছে।" এর সাথে তিনি কোন শর্ত রাখেন নি, এমন অসুখ বা এত লম্বা সফর যদি হয় তবে। আমি সাধারণতঃ সফরের সময় বা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখি না। আজও আমার অসুস্থতার কারণে আমি রোযা রাখি নি।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বড় স্বাভাবিক, সরল -সোজা ছিলেন, কোন প্রকার কৃত্রিমতা বা বানোয়াট কিছু করতেন না। রোযা না রাখলে সহজভাবে মজলিসে তা প্রকাশ করতেন। প্রয়োজনে সেখানে কোন পানীয় পান করতেন। কোন প্রকার লৌকিকতা করতেন না। একবার অনবরত ছ'মাস রোযা রেখেছিলেন। কিন্তু যখন রোযা না রাখতেন তবে মজলিসেও প্রকাশ হয়ে যেত, কিছু পানীয় প্রয়োজনে পান করতেন। একবার অনেক বড় প্রতিবাদের ঝড় ফেৎনার আকারে ধারণ করেছিল। মৌলভীরা খুব উচ্চবাচ্য করেছিলেন যে, হযরত মির্যা সাহেব রোযার অবমাননা করেছেন। অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাঁর স্বভাবের মধ্যে বানোয়াট করার অভ্যাস ছিল না, লৌকিকতাও ছিল না। অতি স্বাভাবিক ছিলেন। ঘটনা একটি ঘটেছিল এই যে, তিনি গলায় শুষ্কতা অনুভব করছিলেন। কিন্তু পান করার জন্য কোন কিছু চান নি। কিন্তু একজন হযরতের (আঃ) প্রয়োজন বুঝতে পেরে পান করার জন্য একটি গ্লাস হুযূর (আঃ)-এর সামনে তুলে ধরেছিলেন। এখন হযরত (আঃ) ভাবলেন 'এখন যদি আমি এ গ্লাস থেকে কিছু পান না করি তবে এটা রেয়াকারী বা লোক দেখানো হয়ে যাবে। অতএব তিনি ঐ গ্লাস নিলেন এবং তা থেকে কিছুটা পান করলেন। আল্লাহ্তাআলা রেয়াকারী লোক দেখানো) পসন্দ করেন না। আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে তৌফীক দান করুন। আগামীকাল থেকে রোযা আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে সকল প্রকার রেয়াকারী থেকে মুক্ত থেকে সকল ঝগড়া-ঝাটি থেকে বিরত থেকো মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থেকো রমযান উদ্‌যাপনের তৌফীক দান করুন। মাত্র কয়দিন। গণনা কৃত কয়দিন মাত্র। দেখতে দেখতে কেটে যায়। দোয়া করুন আমরা যেন প্রকৃত ও সত্য রোযা রাখার সৌভাগ্য লাভ করি, আমীন। (পুনঃ প্রকাশ)

অনুবাদ- মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(০২-০৪-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরাতুল আনকাবূতের ৪৭ আয়াতটি এরূপ ঃ "এবং তোমরা আহলে কিতাবের সঙ্গে শুধু উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করবে, তাদের মাঝে সেসব লোক ছাড়া যারা যুলুম করেছে তাদের সঙ্গে আদৌ বিতর্ক করবে না। আর তুমি (তাদের জন্য) বল, আমরা ঈমান এনেছি এর ওপরে যা আমাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে ... শেষ পর্যন্ত।

এ আয়াত অনুযায়ী আহলে কিতাবের যারা যুলুম করেছে তাদের সাথে বিতর্ক করতে নিষেধ করা হয়েছে- এর ব্যাখ্যা কী?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো- 'যা আমাদের ওপরে নাযেল হয়েছে আর যা তোমাদের ওপরে নাযেল হয়েছে' – তার ওপরে ঈমান আনার অর্থ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আগে দিচ্ছি। এখানে তোমাদের ওপর নাযেল হয়েছে বলতে Old testament (পুরাতন নিয়ম) ও New testament (নতুন নিয়ম) বুঝাচ্ছে। এগুলোর ওপরেও ঈমান আনতে বলা হয়েছে এবং কুরআনে করীমের ওপরে ঈমান আনতে বলা হয়েছে যা রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি নাযেল করা হয়েছে। আহলে কিতাবের সাথে কথা বলার সময় এ দিকটা সামনে আসে। এখানে ৩টির ওপরই ঈমান আনতে বলা হয়েছে।

আর প্রথম প্রশ্নে যে যুক্তির মাধ্যমে আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করতে বলা হয়েছে তার অর্থ হলো সবসময় শক্তিশালী ও উৎকৃষ্ট যুক্তি ও প্রমাণ দিতে বলা হয়েছে। যুক্তি প্রমাণের সাথে কথা বলবে। কুরআনে করীমের অন্যত্র এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যেমন **ইদফা বিল্লাতি হিয়া আহসানু সাইয়্যাহ্** - অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। তুমি যখন তাদের সাথে বিতর্ক কর তখন উৎকৃষ্ট যুক্তি পেশ কর।

প্রশ্ন নং ২ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরাতুস্ সাবা ১৪নং আয়াতের বাংলা অনুবাদ এরকম ঃ

'সে যা চাইত তারা তার জন্যে তা-ই নির্মাণ করতো যথা ঃ ইবাদতখানা। ঢালাই করা মূর্তি, পুকুর সদৃশ গামলা, আর (চুলায়) বড় বড় ডেগ ... শেষ পর্যন্ত।

হযরত সুলায়মান (আঃ) মূর্তি দিয়ে কী করতেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তাদের যুগে দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের মূর্তি বা প্রতিমূর্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল না। এগুলো নিষিদ্ধ হয় পরে। দাউদ (আঃ) একজন প্রাচুর্যশালী বাদশা ছিলেন। আল্লাহ্তাআলা তাকে অনেক দিয়েছিলেন এবং অনুষ্ঠানাদিতে বড় বড় ডেগ ব্যবহার করা হতো। অর্থাৎ খাবারের ব্যবস্থা থাকতো সব সময়। তাই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে আদেশ দেয়া হয়েছে হযরত দাউদকে। তামসীল শব্দের অর্থ মূর্তি নয়। এটি এক ধরনের ছবি। মূর্তি ছিল না। এর আরও ব্যাখ্যা আছে। আপাততঃ এখন তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কুরআনের তফসীর থেকে দেখা যেতে পারে। (রেকর্ডিং খারাপ হওয়ার জন্যে পরের অংশ বুঝা গেল না- অনুবাদক)।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ আমরা শুনতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হুযূর পাক (সঃ)-এর ব্যবহৃত বিভিন্ন স্মৃতি চিহ্ন এবং তাঁর দৈহিক কিছু অংশ বেশ যত্ন সহকারে রাখা আছে। সম্প্রতি কাশ্মীরে হযরত বল দরগায় হুযূর (সঃ)-এর চুল নিয়ে সংঘর্ষে ৬ ব্যক্তি মারা গেছে। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে যদি আপনি কিছু আলোকপাত করেন তাহলে আমরা উপকৃত হবো।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কাশ্মীরের মসজিদে যে চুল সংরক্ষিত আছে তা নিয়ে বাদানুবাদ হয়ে এক পর্যায়ে মানুষ নিহত হয়েছে। চুলের যে চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে তা অনেক মোটা অথচ হযরত নবী করীম (সঃ)-এর চুল ছিলো চিকন রেশমী ধরনের। হুযূর (সঃ) এর পবিত্র চুলের সাথে এর মিল নেই। তাই আমার মনে হয় এটা বানানো। তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হুযূর (সঃ)-এর জিনিসপত্র আছে বলে দাবী করে তাঁর পবিত্র কাপড়ের কথা বলে। এর সত্যতা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু রসূলে করীম (সঃ)-এর চিঠির কথা আমি বলতে পারি। যেগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন রাজা বাদশাহ্দের কাছে রয়েছে। এগুলো তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের নিকট পাঠিয়েছিলো।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ ভবিষ্যতে আহমদীয়া রাষ্ট্রে আহমদীরা তাদের চাঁদা নিজ নিজ দেশে সরকারী দপ্তরে জমা দেবে না আহমদীয়া জামাতের নিজস্ব বায়তুল মালে জমা দেবে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ জামাতের বায়তুল মাল আর সরকারী কোষাগারে কোন পার্থক্য থাকবে না।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ বিভিন্ন জাতির ছেলেমেয়েদের মাঝে বিয়ের ব্যাপারে হুযূর (আইঃ)-এর মতামত কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বিভিন্ন জাতির ছেলে-মেয়েদের মাঝে বিয়ে-সাদীর মাঝে অপসন্দনীয় কিছু নেই। এমন কিছু নেই যে, ঘৃণা করা যায়। শর্ত হলো যার সাথে বিয়ে হচ্ছে তাকে আহমদী হতে হবে। বিভিন্ন বর্ণের মাঝে বিয়ে-সাদী একটি ভাল রীতি। আমি এটি পসন্দ করি তবে ছেলেকে অবশ্যই আহমদী হতে হবে।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ এদেশে পাঁচ জনে একজন বাম হাতে লেখে কিন্তু উপমহাদেশে এর সংখ্যা নগণ্য। প্রশ্ন হলো যারা বাম হাতে কাজ করে তাদেরকে জোর করে ডান হাতে কাজ করানো কি যুক্তি-যুক্ত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই। কিছু এমন কাজ আছে যা বাম হাত দিয়েই করতে হয় যেমন শৌচকর্ম করা। তেমনি কারও সাথে মোসাফাহা করতে হলে ডান হাত দিয়ে করতে হয়।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে কুরআনও বাইবেল যা পেশ করে তার মধ্যে পার্থক্য কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে কুরআন ও বাইবেল যে তথ্য পেশ করে তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। দিবা-রাত্রের মত পার্থক্য। বাইবেল যা বলে তা অর্থহীন ও যুক্তিহীন। মানুষের বিবেক তা গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কুরআনে করীম যে বিবরণ দিয়েছে তা অসাধারণ। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে কুরআন করীম খুঁটি-নাটি সব কিছু বর্ণনা করেছে।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে কী আছে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পৃথিবীর যে স্তরে আমরা আছি তার নিম্নস্তরে রয়েছে 'লাভা' এটি খুবই গরম। পাহাড় থেকে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে লাভা বের হয় তার তাপমাত্রা অচিন্তনীয়।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ সিনেমা ও থিয়েটার দেখার ব্যাপারে হুযূর কিছু বলুন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সিনেমা ও থিয়েটারে যাওয়া একটি অপন্দনীয় কাজ।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ কুরআন শরীফের সূরাগুলোর নামকরণ কে করেছেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কুরআন করীমের সূরাগুলোর নামকরণ করেছেন আঁ হযরত (সঃ) হযরত জিব্‌রাঈলের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায়। পারার নামগুলো পরবর্তীতে রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ আর্ট ধর্মের জন্যে কতটা উপকারী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আর্টের অর্থ যদি চিত্রাঙ্কণ হয় তাহলে তা ধর্মের কোন কাজে লাগে বলে আমি মনে করি না।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ আমরা জানি পৃথিবীতে দারিদ্রের কারণ হলো অসম বন্টন। হুযূর কি মনে করেন যখন আহমদীয়তের বিজয় হবে তখন খাদ্যের সুষম বন্টন হবে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই। এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ কুরআন করীমে নানা প্রকার খাবার ও জন্তুর কথা আছে। কোন ফুলের কথা আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আমি মনে করতে পারছি না কুরআনে কোন ফুলের কথা আছে কিনা।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ তেল আর পানি মিলে না কেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ তেল পানির তুলনায় হালকা তাই তেল ওপরে ভেসে ওঠে। মিশিয়ে দিলেও তা পানির ওপরে চলে আসে।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ জার্মানীর কোন এক ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমার প্রশ্ন। দু'জন খুনী বিনা কারণে হত্যা করার কথা স্বীকার করে এবং বলে, শয়তান তাদের এ কাজ করতে আদেশ দিয়েছে। শয়তান কি এমন কোন আদেশ দেয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ শয়তানতো মানুষকে অহরহ এ ধরনের খারাপ কাজের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে তারা যখন এ কাজ করছিলো তখন তাদেরকে প্ররোচিত করছিলো। কিন্তু তারা যেভাবে বলেছে এ অর্থে শয়তানের নির্দেশ ছিল না। এটি আসলে মানসিক ব্যাধি ছিল। শাস্তিকে এড়ানোর জন্যে শয়তানের বাহানা করেছে।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ কুরআন করীমের সূরা শোয়ারার ২২৪-২২৭ তে আছে। তারা কান পেতে থাকে, তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর যে আছে কবিরা - বিপথগামীরাই তাদের অনুসরণ করে। তুমি কি লক্ষ্য কর নি যে, তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়, আর তারা যা বলে তা তারা পালন করে না? তিনটি আয়াত ব্যাখ্যা করার অনুরোধ করছি।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এখানে কবিদের বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যের দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। যখনই কোন কবিতার আসরের কথা শুনেন তারা তাতে স্বরচিত কবিতা বা অন্যের রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। তখন তারা বাস্তব কথা বলেন না। তারা কল্পনার জগতে বিচরণ করেন। পাশ্চাত্য তাদের বিজ্ঞানের জগতে যা করতে পারে নি প্রাচ্য সেখানে কবিতার জগতে হাবুডুবু খেয়ে তা করে ফেলেছে। তাদের কবিতা শুনে তো তা-ই মনে হয়। আমি নিজেও কবিতার আসর শুনি। তখন আমার কুরআনের এ আয়াতের কথা মনে হয়- তারা কল্পনার জগতে হাবু-ডুবু খেতে থাকে। আর কেবল পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুসরণ করে।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের বিরুদ্ধে গেলে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যায়। এ অবাধ্য হওয়ার সীমা-রেখা সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করলে ভাল হয়।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের অবাধ্যতার তো কোন সীমা নেই। এজন্য শূন্য থেকে আরম্ভ করে চরমভাবে তা করতে পারে। যতটা ভাবা যায় তার কল্পনার সীমাও সে অতিক্রম করতে পারে।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ কুরআন শরীফে আল মুহ্‌সানাত শব্দ এসেছে! এর অর্থ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ 'মুহসানাত' বলতে স্বাধীন নারীদেরকে বুঝায় যারা দাসী নয়।

সংকলন ও অনুবাদ -নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

অমৃতবাণী

(৪র্থ পাতার পর)

মানুষ এই দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকে। বরং এর একটি তাৎপর্য ও ইহার একটি প্রভাব আছে, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের প্রকৃতিতে ইহা আছে যে, সে যত কম খায় ততই তার আত্মা পবিত্র হয় এবং 'কাশ্‌ফী-শক্তি' (দিব্য-দর্শনের শক্তি) বৃদ্ধি লাভ করে। এতে খোদাতাআলার ইচ্ছা ইহাই যে, একটি খাদ্য কম কর এবং অন্যটিকে বাড়াও" (মলফূযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)।

❑ "সর্বদা রোযাদারের এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদাতাআলার যিক্‌র-এ মগ্ন থাকবে যাহাতে দুনিয়া ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌মুখী হওয়া যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে এবং নিছক রুসুম হিসাবে রাখে না, তাদের উচিত আল্লাহ্‌তাআলার 'হাম্‌দ' (প্রশংসা), 'তসবীহ্' (গুণ-কীর্তন করা) ও তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে মগ্ন থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়" (মলফূযাত, নবম খন্ড পৃঃ ১২৩)।

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

পর্ব ১ ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ইউরোপীয় মতবাদ

এবারে আমরা নাস্তিকতাবাদী দর্শন ও তার প্রবক্তাদের মধ্য থেকে দু'একজনকে নিয়ে কিছু আলোচনা করব। পুরো উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দী ধরে তাদের দর্শন ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই আসে কার্ল মার্কসের (১৮১৮-১৮৮৫) কথা। তার মতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অস্বীকৃতি কোন সামান্য বিষয় নয়, বরং এটাই তার দর্শনের মূল কথা। মনে হয় সেই সময়কার খ্রীষ্টীয় চার্চসমূহে ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা ও ব্যাখ্যা এতটাই অবোধ্য ও সাধারণের চিন্তা-চেতনা উর্ধ্বে ছিল যে, স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি প্রয়োগে তার সম্যক উপলব্ধি ছিল একান্তই পীড়াদায়ক। এজন্যই সে সময়কার কিছু বুদ্ধিজীবী জ্ঞান ও সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত অবস্থায় গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ পরিহার করেন এবং কেউ কেউ নাস্তিক হয়ে যান। পরিণতিতে এদের অনেকে যেমন সাত্রে, এংগেলস্, লেনিন প্রভৃতি বিরাজমান সংকট থেকে মুক্তির পথের সন্ধানে বিবেক, যুক্তি ও জ্ঞানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কথা বলেন। প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকে পরিহার করে তারা খোদাবিহীন দর্শনের আমদানী করেন। ফিরিশ্‌তার আগমন, ঐশীবাণী এসবকে তারা মানুষের মনস্তাত্বিক চিন্তা-চেতনা অথবা আত্মার দুঃসময় অভিব্যক্তিরূপে ব্যাখ্যা করেন। যেহেতু তারা যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের চর্চা ও জ্ঞানের সাথে কর্মের সংযোগের মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের কথা বলেন, অচিরেই বিভিন্ন সমাজ থেকে এর একটা চাহিদা তৈরী হয়। পরিণতিতে, কার্ল মার্কসের এ দর্শন তদানীন্তন সামাজিক অগ্রগতির একটি চালক হিসাবে মানব রচিত রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মের ভূমিকায় (man-made politico-economic religion) অবতীর্ণ হয়। অন্য কথায়, এটাই সমাজতান্ত্রিক দর্শন (communist philosophy) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

মার্কসীয় বা সমাজতান্ত্রিক দর্শনের একজন প্রধান ব্যাখ্যাকার হচ্ছেন এংগেলস। তিনি হ্যাগেলীয় দর্শনের কোন কোন বিষয় যেমন চূড়ান্ত সত্যের (absolute truth) ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। তবে বেশির ভাগ মার্কসীর পন্ডিতের মতে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই, এটা সব সময়ই

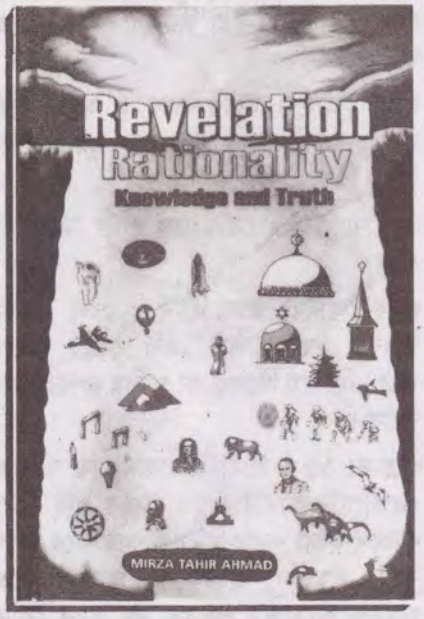

একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে আপেক্ষিক বিষয়। মার্কসীয় দর্শনের আর একজন রূপকার হচ্ছেন লেনিন। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং রচনায় মার্কসীয় দর্শন, বিশেষ করে দ্বান্দিক বস্তুবাদ (dialectical materialism) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এটা হচ্ছে পুরাপুরি নাস্তিক ও সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিরোধী। ধর্ম এবং নৈতিকতার কোন স্থান এখানে নেই। তাই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রথম দিকে যারা সমাজতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে নৈতিকতার বিষয়ে কিছুটা নমনীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন, লেনিন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদেরকে আক্রমণ করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, নিছক একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন হিসাবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এটা একটা ধর্ম বিরোধী জীবন বিধানে পরিণত হয়, আর মার্কস হয়ে উঠেন এই খোদাহীন ধর্মের প্রধান পুরোহিত। আমরা এখানে ধর্ম ও নৈতিকতা সম্পর্কে মার্কসীয় দর্শন ও ইসলামী ভাবধারার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরছি।

ইসলামসহ বেশির ভাগ ধর্মই খোদার অস্তিত্ব ও ঐশীবাণীর স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মার্কসীয় দর্শনের অনুসারীকে খোদা ও ওহীর প্রতি অস্বীকৃতি এবং সার্বিকভাবে ধর্মের শত্রু স্থানীয় হতে হয়। আসলে ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে মার্কসের পূর্বে যেসব নাস্তিক্যবাদীর আবির্ভাব হয়েছে তারা শুধু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খোদা আছেন কি নেই এ দুই সীমা রেখার মধ্যে অবস্থান করেছেন। মার্কসই প্রথম সরাসরি খোদা এবং ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এর বিরুদ্ধে প্রচারণা ও অন্যান্য কর্ম কৌশল গ্রহণ করেছেন। হেগেলের চূড়ান্ত ভাববাদকেও তিনি অস্বীকার করেন। কেননা, তিনি ছিলেন খুবই চতুর প্রকৃতির লোক। তিনি একথা ভালভাবেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, হেগেলের বিষয়-ভিত্তিক (subjective) ধারণা থেকে কোন বস্তুর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের (objective) উৎপত্তি সংক্রান্ত দর্শন মেনে নিলে কার্য-কারণ শৃঙ্খলের নিয়মে বিষয়কে চেতনায় আনা বা চিন্তা করার জন্য এমন এক অস্তিত্বের স্বীকৃতি মেনে নিতে হবে, যাকে শেষ পর্যন্ত স্রষ্টা বা আল্লাহ্ নামে অভিহিত করতে হবে। তাই, তিনি বস্তুকে ভাবের পূর্বে স্থান দিয়ে সমস্ত বিশ্বজগত এক স্বায়ত্ব-শাসিত প্রকৃতির নিয়মে চলছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এখানে ঈশ্বর, ধর্ম ও নৈতিকতার কোন প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে, সমাজতন্ত্র বা মার্কসীয় দর্শনে ঐশীবাণীর প্রয়োজনীয়তা বা নৈতিকতার আদর্শ–এসব কিছুকেই অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ দুনিয়ার মজদুর ও সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতি থেকেই নাকি এ দর্শনের উদ্ভব। এই দুটো তো পরস্পর বিরোধী ধারণা। যদি নৈতিকতাকেই অস্বীকার করা হয়, তা হলে সর্বহারাদের প্রতি সহানুভূতি কীভাবে আসবে? সম্ভবত মার্কস ভেবেছিলেন যে, সামন্তবাদী সমাজ ও ভূস্বামীদেরকে বিপ্লবের মাধ্যমে হটিয়ে সর্বহারাদের রাজত্ব কায়েম করতে হবে। তাই সেখানে নীতি-নৈতিকতার কোন স্থান রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'-সেটা তাদেরকে মেরে, লুণ্ঠন করে, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যেভাবেই হোক্ না কেন। এখানে নৈতিকতার কোন স্থান নেই।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। একথা লক্ষ্য না করে পারা যায় না যে, ডারউইনের সাড়া জাগানো বিষয় 'বাঁচার জন্য সংগ্রাম' (struggle for existence) তত্ত্ব দ্বারা কার্ল মার্কস খুবই প্রভাবিত হন। তার দ্বান্দিক বস্তুবাদ অন্য কথায় বাঁচার জন্য সংগ্রামেরই অন্য নাম। তফাত শুধু এই যে, ডারউইন এটা বিভিন্ন প্রাণী প্রজাতির জীবন সংগ্রাম ও স্থিতিশীলতা ব্যাখ্যা করার জন্য বলেছিলেন, মার্কস সেটাই মানুষের বেলায় প্রয়োগ করেছেন।

তবে মার্কসের এ দর্শন কেন জার্মানীতে বাস্তবায়ন করা গেল না তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

যদি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পরিণতিতে নিজে থেকেই এ ধরনের একটা সর্বহারার বিপ্লব সংঘটিত হতে পারতো, তা হলে তার জন্য জার্মান ছিল একটা অধিক উপযোগী দেশ। কেননা, সেটা রাশিয়ার থেকে শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা ছিল। কিন্তু সেখানে এংগেলসের মত চিন্তাশীল ও সম্পদশীল ও সম্পদশালী বন্ধু বা লেনিনের মত নিরলস কর্মী এবং জারের শাসন অতিষ্ঠ একটা বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর অভাব ছিল। সেদিক থেকে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের বিপ্লব বা লেনিনের সাফল্য একটা কাকতালীয় ঘটনা বৈ অন্য কিছু নয়। জারের দীর্ঘ দুঃশাসনে রাশিয়ার অবস্থা তখন এমন ছিল যে, এটা যদি সর্বহারা বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘটনা না হতো, তাহলে অন্য কোন নামে পরিবর্তন অবশ্যই সংঘটিত হতো। এটা রাশিয়ার বা লেনিনের সৌভাগ্য যে বিপ্লবের এমন একটা পরিপক্ক অবস্থায় সর্বহারাদের সংঘটিত করে পুঁজিবাদের কফিনে শেষ পেরেকটি ঢুকাবার কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। এ সাময়িক সাফল্য যতটুকু না দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রাপ্য, তার চেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবীদার সেই সময়কার বিরাজমান অবস্থা ও লেনিনের বিপ্লবী নেতৃত্ব।

আরেকটি বৈপরীত্যের জন্য মার্কসীয় দর্শনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। তাহলো মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ মন ও তার শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছে। সম্ভবত মনকে পরীক্ষাগারে অন্যান্য বস্তুর মত পরীক্ষা করা যায় না বলেই তারা এটা করেছে। আমরা জানি মন হচ্ছে মস্তিষ্কের কায়াহীন একটি অবস্থা যার মধ্যে আমাদের বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা অবস্থান করে। দেখা যায় না বলে মন নেই এ কথা বলা যাবে না। মার্কসীয় দর্শনের একটি অন্যতম ভিত্তি হলো অল্প পুঁজির বিনিময়ে বেশি শ্রম নিয়ে পুঁজিপতিরা অন্যায়ভাবে যে ধন-সম্পদ জড়ো করেছে, তার বেশির ভাগ শ্রমিকের প্রাপ্য। তাদের সে পাওনা তারা জোর করে আদায় করে নিবে। অথচ একথা কে না জানে যে, শুধু পুঁজি বা শ্রম দিলেই উৎপাদন হয় না। উৎপাদনের পিছনে একটি চিন্তাশীল মন কাজ করে। কী কী উপাদান দিয়ে কতটুকু উৎপাদন হবে, তার অনুপাত কী হবে এসব ভাবনা চিন্তা কে করে, অথবা এর পিছনে কী ক্রিয়াশীল থাকে? এসব কিছুর পশ্চাতে কাজ করে আমাদের মন; অথচ মার্কসীয় দর্শনে এর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে।

আমরা এ-ও জানি, মনের শক্তি ভাল-মন্দ দু'দিকেই ব্যবহৃত হতে পারে। মনের শক্তি ও শ্রমের বিনিময়ে কোন কিছু উৎপাদিত হয়। শ্রমিকেরা শ্রম প্রদান করে, কিন্তু একটা উন্নত দেশ আর একটা অনুন্নত দেশের শ্রমিকের যে সামর্থ্য তা এক নয়। এ সামর্থ্য কীভাবে কম বেশি হয়? জ্ঞান, দক্ষতা ও মনের শক্তির উপরই তা নির্ভর করে। তাই পুঁজিবাদী দেশসমূহে শুধু সম্পদ থাকলেই উৎপাদন হবে না, এর সাথে মনের শক্তির ও সংযোগ থাকতে হবে। আবার এ মনের শক্তি যদি নেতিবাচক হয়, তখন সৃষ্টি হবে মাফিয়াদের। এসব মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর বঞ্চিত জনগণ সম্মিলিত হয়েও কিছু করতে পারবে না! কেন পারবে না? মূলতঃ মনের শক্তির তারতম্যের কারণেই। আর দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, আজ বাহ্যিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন কর্মকান্ড যাদের নিয়ন্ত্রণে তারা স্বল্প সংখ্যক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মাফিয়া চক্রের লোক। নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতাই যার মূল কারণ। ধর্মহীন হওয়ার ফলেই তারা নিষ্ঠুরতার বিভিন্ন পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারে।

বিবেকবুদ্ধি রহিত ও প্রবৃত্তির উন্মাদনায় তাড়িত পুঁজিবাদী সমাজের এসব অনাচার নৈতিকতার বালাই না থাকার কারণেই সৃষ্ট হয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হলো এই যে, সর্বহারা সমাজও ক্ষমতা পেয়ে মাফিয়াদের মত কাজ করেছে। চরম নিষ্ঠুরতা ও ইস্পাত-কঠিন হাতে তারা তাদের বিরুদ্ধ শ্রেণীকে দমন করেছে। তাদের এই হৃদয়হীনতার পশ্চাতে কোন নৈতিকতা ছিল না। আর তাই তাদের সেই সমাজ ব্যবস্থাও বেশি দিন স্থায়ী ... সমাজতন্ত্রের পতনের অন্যতম কারণ ছিল এটি।

আরেকটি ব্যাপার হলো মানবাধিকারের সার্বজনীনতা। পুঁজিবাদে এ অধিকারের কিছুটা হলেও স্বীকৃতি আছে, কিন্তু সমাজতন্ত্রে তা একেবারেই নেই। ক্ষমতার বলয় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে থাকায় এবং তারা দুর্নীতির প্রশ্রয় নেওয়ায়, সমাজতন্ত্র এক পর্যায়ে স্বৈরতন্ত্রের রূপ নেয় এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিরেট দুর্নীতিতে পর্যবসিত হয় (absolute dictatorship corrupts absolutely)। তাছাড়া, শ্রেণী-স্বার্থের বাইরে মানুষ যেতে পারে না এরূপ অমানবিক ভাবধারাও সমাজতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। আর ব্যাপক দুর্নীতি, যার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে, সমাজতন্ত্র ধ্বংসের এক অন্যতম কারণ ছিল। সর্বহারা সমাজে নৈতিকতার কোন গুরুত্ব না থাকাতেই সমাজতন্ত্রের ধ্বংস ত্বরান্বিত হয়েছিল।

এ প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কথা কিছু বলা দরকার। ধর্ম আমাদের এ কথা শিক্ষা দেয় যে, মানব রচিত কোন ব্যবস্থা বা আইন দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত পাপ দূরীভূত হয় না। এর জন্য ঐশী বিধান ও তার সঠিক অনুসরণ একান্ত দরকার। আল্লাহ্‌র নবী, রসূল ও খলীফাগণ এ ঐশী বিধান পালন ও অন্যের মধ্যে সঞ্চালন করে থাকেন। দুনিয়াবী এক নায়ক বা স্বৈরশাসক এবং নবী-রসূলদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে, স্বৈরাচার কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হয় না, কিন্তু নবী-রসূলগণ একটি ঐশী বিধান দ্বারা পরিচালিত ও তার পরিপূর্ণ অনুসরণকারী হয়ে থাকেন। নৈতিক চেতনার দিক থেকে এ দু'ইয়ের মধ্যে রয়েছে তাই আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা বলতে চাই যে, মানুষে মানুষে বৈষম্য বা অসমতা শুধু অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট নয়, যেরূপভাবে মার্কসীয় দর্শনে বলা হয়েছে। আর্থিক দিক থেকে একটি সমাজে সকলের সাম্য অবস্থা বিরাজ করলেই সেই সমাজ দুর্নীতিমুক্ত হয় না। মানুষের এ অসাম্য অবস্থান তার বাহ্যিক, মানসিক এবং অন্যান্য বৃত্তির দিক থেকেও হতে পারে। মানুষের প্রকৃতিগত এ বিভিন্নতা কোন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব নয়, বরং ঐশী উৎস এবং ঐশী বাণীর আলোকে প্রণীত বিধি-বিধান প্রয়োগ করেই তা সম্ভব। এজন্য আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও তার সঠিক বিধান প্রয়োগের কোন বিকল্প হতে পারে না।

এতক্ষণ ধরে খোদাবিহীন মার্কসীয় দর্শন ও ঐশীবাণীর সত্যতা সম্পর্কিত আলোচনার রেশ ধরে বলা যায় যে, মানব রচিত বিধানে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্লেদ ও পাপরাশি দূরীভূত হয় না। এর জন্য অবশ্যই তার চরিত্র সংশোধন ও আত্মিক জাগরণ ঘটাতে হবে, যা ঐশী বিধানের অনুসরণ ব্যতিরেকে কখনো সম্ভবপর নয়। আমরা যদি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই ঐশী বিধানকে না মেনে চলি, তাহলে একথা অনস্বীকার্য যে, শান্তিও অচিরেই আমাদের ছেড়ে যাবে। জাগতিকভাবে শত চেষ্টা করেও তাকে আর আমরা ফিরিয়ে আনতে পারবো না।

পরিশেষে বলতে চাই শুধু যুক্তি, তার সাথে যদি ঐশী শক্তির সমন্বয় না হয়, তাহলে তা কোন দিনই শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে না। ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও তাই দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌র নবী-রসূলগণ যুগে যুগে মানুষের ভিতরের পশুত্ব ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যখন মানুষকে ঐশী রংয়ে রঙীন করেছেন, তখনই মাত্র শান্তিপূর্ণ সমাজ কায়েম হয়েছে। যদি তা না হতো, তা হলে আজকে যতটুকু ক্ষয়িষ্ণু বা অবক্ষয়ক্লিষ্ট সমাজ আমরা দেখি, তার চেয়েও শতগুণ অধঃপতিত সমাজ আমরা দেখতাম। তাই, মানুষের সার্বজনীন সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য ঐশীবাণী ও সত্যের প্রয়োজন একান্তই অপরিহার্য। (চলবে)

অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

তরবিয়তে আওলাদ

[জার্মানীতে ২০০১ইং সালে আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় ২৫ আগস্ট তারিখে হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ] (মেনহায়েম-জার্মানী, ২৫ আগষ্ট ২০০১ইং)

নিজ সন্তানের সাথে ন্যায়-নীতি ও সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার কর। শিশু সন্তানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাদেরকে উত্তম তরবিয়ত (প্রশিক্ষণ) দিয়ে গড়ে তোল।

সন্তানদের বেশি আদর-আহ্লাদও মানুষকে অনেক বড় বড় ফেতনা-পরীক্ষায় ফেলে দেয়।

যতক্ষণ না নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর ততক্ষণ সন্তানদেরকে তোমাদের কেবল মৌখিক উপদেশ কোনও কাজে আসবে না।

শৈশবকাল থেকেই শিশু- মনে মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা অতি আবশ্যকীয়।

যে বাড়ীতে সবসময় দোয়া অব্যাহত থাকে একে আল্লাহ্তাআলা বিনষ্ট হতে দেন না।

হুযূর (আইঃ) তাশাহ্হুদ তাআউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা আত্-তাহরীমের ৭ম আয়াত তিলাওয়াত করেন। তারপর বলেন, আয়াতটির সরল তরজমা হলো ঃ 'হে যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে ও নিজ পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানী হচ্ছে মানুষ ও পাথর। এর ওপর (নিযুক্ত) রয়েছে অত্যন্ত কঠোর ও শক্তিশালী ফিরিশ্তারা, তিনি তাদেরকে যে আদেশই দেন তারা তাতে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে না, আর তাদের-কে যে আদেশ্যই দেয়া হয় তা-ই তারা পালন করে।'

হুযূর বলেন, আজ ভাষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে সন্তানদের তরবিয়ত (শিক্ষা-দীক্ষা ও চরিত্র-গঠন)। আমি আশা রাখি, ইনশাআল্লাহ্ এ ভাষণের আলোকে মায়েরা নিজ সন্তানদেরকে উত্তম তরবিয়ত প্রদান করবেন। তারা তাদের ভবিষ্যৎ (ভরসাস্থল-স্বরূপ)। সর্বপ্রথম আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "প্রত্যেক শিশুকে আল্লাহ্ ইসলামী স্বভাবে সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে তার বাবা-মা তাকে ইহুদী বা খ্রীষ্টান অথবা মাজুসী (অগ্নি-উপাসক) বানায়" (মুসলিম, কিতাবুল কাদর)। অতএব এটা অনেক বড় এক সুসংবাদ যে, প্রত্যেক শিশুকে আল্লাহ্ মানব প্রকৃতির স্বচ্ছ স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেন, তা সে যে কেউ-হোক। কোন কোন মানব সন্তান বলৎকার প্রসূত হয়ে থাকে। বোসনিয়ায় বিপুল সংখ্যায় ওরূপ সন্তানের জন্ম হয়েছিল। তাদের মায়েরা আমাকে প্রশ্ন করেছিল, 'এসব শিশুর কী হবে?' আমি বললাম, এ শিশুদের তো কোন দোষ নেই, এরা জান্নাতী। কিন্তু ঐ যারা যালেম তারা জাহান্নামী। কেননা আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেছেন, সকল শিশু প্রাকৃতিক স্বভাবে জন্ম লাভ করে। কাজেই আমাদের মায়েদেরও চিন্তা করা উচিত, সন্তানরা তো প্রকৃতিগত ধর্ম ও স্বভাবে জন্ম নেয়। তারপর আপনাদের তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে ওঠে যদি ইহুদী বা খ্রীষ্টান হয়ে যায় তাহলে এতে সন্তানদের কোন দোষ নেই, এর জন্য সব দোষ বাবা মায়েরই হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন যে, হযরত আইউব (আঃ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, "উত্তম তরবিয়তের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কোন তোহ্ফা নেই যা পিতা তার সন্তানদেরকে দিতে পারেন" (তিরমিযী, আবওয়াবুল বির্‌রে ওয়াস্‌সিলাহ্ বাবু ফিঅলাবিল ওলাদ)।

শিশু-কিশোরদের বন্ধু নির্বাচন ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন ঃ 'মানুষ তার বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত (বা তাদের প্রভাবাধীন) হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন খেয়াল রাখে, সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে' (তিরমিযী, আবওয়াবুয্ যুহ্দ)। অতএব শৈশবকাল থেকেই শিশু-কিশোরদের বন্ধুদের প্রতি নজর রাখা একান্ত আবশ্যক। অনেকে এদিকে উদাসীন হয়ে থাকেন অথচ কী ধরনের বন্ধু বাবা-মা তা দেখতে পান। বন্ধুরা যদি ভাল হয় তা হলে সন্তানরাও ভাল শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে উঠবে। কাজেই আপনারা এ বিষয়টির দিকে সবসময় খেয়াল রাখুন। যদি দেখেন সন্তানদের বন্ধুরা অবাঞ্ছিত তাহলে বন্ধুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে সচেষ্ট হোন। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পড়ে শুনাচ্ছি ঃ

"খুবই স্মরণ রাখার বিষয় যে, খোদাতাআলার সাথে কারও যতক্ষণ সত্যিকার সম্পর্ক না হয় ততক্ষণ অন্য কোন কিছুই তার কাজে আসতে পারে না। ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য করুন! তারা কি নবীদের সন্তান-সন্ততি (বংশধর) নয়?এরাই সে জাতি যারা এ নিয়ে গর্ব করতো এবং বলতো ঃ **'নাহ্নু আব্নাউল্লাহি ওয়া আহিব্বাউহু'**- 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁরই প্রিয়জন'। কিন্তু তারা যখন আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলো এবং দুনিয়াকে অগ্রগণ্য করে নিল তখন এর কী ফল হলো? খোদাতাআলা তাদেরকে শূকর ও বানর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এখন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাদের যা অবস্থা তা কারও কাছে গোপন নয়" (মলফূযাত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ১০৯-১১০)।

হযরত আবূ কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, মানুষের পক্ষে মৃত্যুর পর সবচেয়ে উত্তম রেখে যাবার জিনিস হচ্ছে তিনটি ঃ এক, পুণ্যবান সন্তান যারা পরবর্তীতে তাদের বাবা-মায়ের জন্য দোয়া করে থাকে। দুই, এমন 'সদকা জারীয়া' (স্থিতিশীল দান) যার সওয়াব সে পেতে থাকে। তিন, এমন জ্ঞান যা তার পরে মানুষ অনুসরণ করে (ইবনে মাজা, বাবু সওয়াবকি মুয়াল্লিমিনান্ নাস) কেবলমাত্র জ্ঞান সদকা জারীয়া নয় বরং এমন জ্ঞান, পরে যার অনুশীলন করা হয়।

বুখারী থেকে একটি হাদীস, যা হযরত আবূ মূসা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, "আমার এক পুত্র জন্মলাভ করলো। তাকে নিয়ে আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তার নাম 'ইব্রাহীম' রাখলেন।' হুযূর (সঃ) সুপ্রত্যাশারূপে শিশুদের ভাল নাম রাখতেন, আপনাদের সন্তানদেরও নাম যেন কেবল শুনতে সুন্দর না হয় বরং তাৎপর্যপূর্ণ এবং উত্তম নাম রাখা উচিত। শিশুরাও অনেক সময় নিজেদের নাম অনুযায়ী গড়ে ওঠে। আঁ হযরত (সঃ)-এর এটাই রীতি ছিল। তার নাম ইব্রাহীম

রাখলেন। তারপর তাকে খেজুর চাখালেন এবং তার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করে দোয়া করলেন" (বুখারী, কিতাবুল আকীকা)। আজকাল তো জন্মের পর মানুষ শিশুদেরকে মধু চাখায়। ঐ যুগে শিশুকে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেজুর চাখানোর কথা প্রমাণিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ "সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা কেবল এ নিয়্যতেই করা উচিত যে, এমন কোন সন্তান যেন জন্মলাভ করে, যে দীনের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়। মানুষের এরূপ পবিত্র আকাঙ্ক্ষা থাকলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে যাকারীয়ার ন্যায় সন্তান দানেও সক্ষম" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৫৭৯)। অর্থাৎ বাহ্যিক অবস্থায় অসম্ভব হলেও যদি কারও অত্যন্ত পাক পবিত্র সন্তান লাভের নিয়্যত থাকে আর এ নিয়্যত নিয়ে সে খোদাতাআলার নিকট কাঁদা-কাটি করতে থাকে এবং নিরাশ না হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, এর ফলে দৃশ্যতঃ বিরূপ অবস্থাতেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পুণ্যবান পবিত্র সন্তান দান কখনও অসম্ভব নয়। অনুরূপ, তিনি (আঃ) আরও বলেন ঃ "কোন কোন সময় সম্পত্তির অধিকারী লোকদের বলতে শোনা যায়, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে এমন কোন সন্তান যেন জন্ম হয় যাতে সম্পত্তি অপরের হাতে চলে না যায়। কিন্তু তারা জানে না, মরে গেলে কে বা অংশীদার আর কে-ইবা সন্তান, সবাই তো তাদের জন্য অপর। কাজেই সন্তানদের জন্য আকাঙ্ক্ষা কেবল এ উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত তারা যেন দীনের সেবক হয়" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১০)।

শিশু-কিশোরের প্রতি সম্মানজনক আচরণ ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "নিজেদের সন্তানদের সাথে সম্মানজনক আচরণ কর এবং তাদেরকে উত্তম তরবিয়ত (শিক্ষা-দীক্ষা) দাও" (ইবনে মাজা, আবওয়াবুল আদাব, বাবু বির্‌রিল ওয়ালিদ)।

এ-ও এক অতি জরুরী বিষয়। শিশুদেরকে বেশি বেশি ধমক দেয়া এবং 'তুই' করে সম্বোধন করায় (তবে তুই প্রীতিচ্ছলে বলতে পারেন কিন্তু) অসম্মান ও অপমানসূচক তুই তুকারি করায় শিশুদের তরবিয়ত (শিষ্টাচার) অবশ্যই লোপ পায়, শৈশবকাল থেকে তার অন্তরে বাবা-মায়ের প্রতি সম্মানবোধ আর অবশিষ্ট থাকে না। ইউ-পি ইত্যাদি অঞ্চলে তো শিশুদেরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করার রেওয়াজ (রীতি) রয়েছে। অতএব যদি আপনি বলে সম্বোধন করতে পারেন তাহলে এটাও বেশ ভাল অভ্যাস বটে। শিশুদের আদব করলে তারা বাবা-মায়েদের আদব করে থাকে। যদি আদব শিক্ষা না দেন তাহলে সন্তানরা বে-আদব হয়ে বড় হয়। আর বড় হয়ে যাওয়ার পরও বাবা-মাকে সম্মান করে না।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি ফাতেমা (রাঃ)-এর চেয়ে আকার-আকৃতি ও চেহারায়, চাল-চলন ও কথা-বার্তায় রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য কাউকে দেখি নি। ফাতেমা (রাঃ) যখনই হুযূর (সঃ)-এর সাথে দেখা করতে যেতেন, হুযূর (সঃ) তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন, তাঁর হাত ধরে তাতে চুমু দিতেন ও তাঁকে নিজের পাশে বসাতেন। তেমনি হুযূর (সঃ) যখন দেখা করতে ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট যেতেন, তখন ফাতেমা উঠে দাঁড়াতেন, হুযূর (সঃ)-এর হাতে চুমু খেতেন এবং নিজের আসনে তাঁকে বসাতেন" (আবু দাউদ)।

'মলফূযাত' থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আরো একটি উদ্ধৃতি ঃ "মানুষ সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা তো খুবই করে, এবং সন্তান হয়েও থাকে। কিন্তু কখনও তাদেরকে সন্তানদের তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষা, উত্তম ও সদাচারী এবং খোদাতাআলার ভক্ত ও অনুগত করে গড়ে তোলার জন্য তৎপর ও উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। তারা এদের জন্য কখনও দোয়াও করে না এবং তরবিয়তের বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতির প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখে না।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উক্ত কথাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর দৃষ্টিতে এরূপ কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা হয়ত তাঁর নিকট সন্তানের জন্য ঐ ধরনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে দোয়ার আবেদন করে থাকবেন আর নিজেরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। কিন্তু এখন আমার যদ্দূর স্মরণ পড়ে, যতজন লোকই তোমার নিকট নিজেদের সন্তানের জন্য পত্র লিখেন তারা প্রায়ই এদের পুণ্যবান হওয়ার জন্য দোয়া করার আবেদন করে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আমার অবস্থা হলো এই যে, আমার এমন কোন নামায নেই, যাতে আমি আমার (জামাতের) বন্ধুদের জন্য এবং তাদের সন্তান ও স্ত্রীদের জন্য দোয়া করি না" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৭২)।

আঁ হযরত (সঃ)-এর সৎপুত্র হযরত আম্র বিন আবূ সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি বাল্যকালে আঁ হযরত (সঃ)-এর গৃহে বাস করতাম। খাবার সময় আমার হাত (খাওয়ার পাত্রে) এদিক-ওদিক দ্রুত ছুটোছুটি করতো। আমার এ অভ্যাসটা দেখে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'হে বালক! খাবার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ পড়বে, ডান হাতে খাবে এবং নিজের সামনে থেকে নিয়ে খাবে।' তখন থেকে আমি সর্বদা আঁ হযরত (সঃ)-এর ঐ উপদেশ অনুযায়ী খাবার খাই" (বুখারী, কিতাবুল আত্‌য়িমা)।

অতএব এ ক্ষেত্রেও শৈশবকালেই তরবিয়ত দিলে তবেই তরবিয়ত হয়। যদি শৈশবকাল থেকে শিশুদের 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলার অভ্যাস না করান তাহলে বড় হয়ে আর হয় না। তেমনি নিজের সামনে থেকে নিয়ে খাওয়া উচিত। পরিবেশিত খাবারের সবখানে হাতের অবাধ বিচরণ অবাঞ্ছনীয়। অতএব যে শিশু খাবারে ভাল জিনিসগুলো- যেমন মাংসের ভাল ভাল টুকরা তালাশ করে বেড়ায় তাকে বুঝান, তার পালা এসে যাবে শান্ত শিষ্টভাবে খাওয়া উচিত। শান্ত শিষ্টভাবে খাওয়াতে হজম শক্তির ওপরও সুপ্রভাব পড়ে। যারা অস্থিরতার মধ্যে খাবার খায় তাদের ক্ষতি হয়।

এক বালক সম্বন্ধে বর্ণনা ঃ

আবূ রাফে বিন আম্র আল্ গিফারী-এর চাচা বর্ণনা করেন, "আমি তখন ছোট বালক ছিলাম, আনসারদের খেজুর গাছে পাথর ছুঁড়ে ফল পাড়তাম। আঁ হযরত (সঃ) সে-দিক দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁর কাছে নিবেদন করা হলো, 'এখানে একটি এমন ছেলে আছে যে আমাদের খেজুর গাছে ঢিল ছুঁড়ে ফল পাড়ে। সুতরাং আমাকে আঁ হযরত (সঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত করা হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'হে বালক! তুমি খেজুরগুলোতে কেন ঢিল ছুঁড়ো?' আমি নিবেদন করলাম, 'যাতে খেজুর খেতে পারি (সেজন্য)।' তিনি ইরশাদ করলেন, 'ভবিষ্যতে খেজুর গাছে আর ঢিল ছুঁড়বে না। তবে যেসব

ফল পড়ে যায় তা খেয়ে নিও। তারপর তিনি আমার মাথায় (আদরের সাথে) হাত বুলালেন এবং দোয়া দিলেন, "আল্লাহুম্মা ইশ্‌বে' বাত্‌নাহু" - হে আল্লাহ্ এর পেট ভরে দাও, একে পরিতৃপ্ত কর" (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩১ বৈরুতে মুদ্রিত)।

অতএব আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত ছিল, ঢিল ছুঁড়া ব্যতিরেকে নীচে পড়া ফল খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু সেই সাথে তিনি দোয়াও দেন, 'হে আল্লাহ্! তার পেট ভরে দাও।' এরপর আজীবন সে বালক (সাহাবী) কখনও লোভ করেন নি।

হালাল ও পবিত্র খাবারের জন্য উপদেশ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার হযরত আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (বালক) সদকার একটি খেজুর মুখে দিলে হুযূর পাক (সঃ) বলেন, 'ছিঃ ছিঃ! তুমি কি জান না আমরা সদকা খাই না?' (বুখারী কিতাবুল জিহাদ)। এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী আঁ হযরত (সঃ) তাঁর নাতির মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খেজুর বের করে ফেলেন।

শিশু-সন্তানদের প্রতি স্নেহ ও তাদের আদর করা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আঁ হযরত [(সঃ) তাঁর নাতি] সান বিন আলীকে চুমু দিলে পাশে বসা (জনৈক ব্যক্তি) আকরা বিন হাবেস তামিমী বললো, 'আমার তো দশজন পুত্র রয়েছে কিন্তু আমি তাদের কাউকে কখনও চুমু দেই নি।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হবে না' (বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

অতএব শিশু-কিশোরদেরকে আদর করা ও চুমু দেয়া - এ হচ্ছে আঁ হযরত (সঃ)-এর সুন্নত। তাদের ছোটদেরও এবং তাদের বড়দেরও তিনি (সঃ) সবসময় আদর করতেন।

বুখারী কিতাবুল আদাবে বর্ণিত একটি হাদীস ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আঁ হযরত (সঃ)-এর খিদমতে এক ব্যক্তি এলো। তার সাথে এক শিশু ছিল। তাকে সে বুকে জড়িয়ে আদর করতে লাগলো। তখন নবী করীম (সঃ) বললেন, 'তুমি কি এর সাথে সদয় ব্যবহার করছো?' সে উত্তর দিল, জী, হুযূর!' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, এ শিশুর প্রতি যে টুকু তুমি দয়া কর আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিয়ামতের দিনে এর চেয়ে অনেক বেশি দয়া করবেন। কেননা আল্লাহ্ 'আরহামুর রাহেমীন' - সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু (আদাবুল মুফরাদ বুখারী, বাবু রাহ্‌মাতিন আয়াল)।

সাহ্‌ল তাঁর পিতার কাছে শুনে বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তাআলা তাবারক ওয়াতাআলার কিছু সংখ্যক বান্দা এমনও আছে যাদের সাথে তিনি কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও সাব্যস্ত করবেন না ও তাদের দিকে চেয়ে তাকাবেনও না।' এ হচ্ছে বড় ধরনের এক হুঁশিয়ারী- আল্লাহ্‌তাআলার চরম অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি। তিনি তো সবাইকে দেখছেন, কিন্তু কোন কোন সময় মানুষের দিক থেকে এমনভাবে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন যে, মানুষ তখন অনুভব করে তিনি তাকে আর দেখছেন না।

হুযূর পাক (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ওসব লোক কারা? হুযূর (সঃ) বলেন, প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে তার বাবা-মায়ের প্রতি ক্ষোভ ও অনীহা পোষণ করে' - তাকেও আল্লাহ্‌তাআলার সদয় দৃষ্টি উপেক্ষা করবে, 'এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে তার সন্তানের প্রতি ক্ষোভ ও অনীহা পোষণ করে তার প্রতিও আল্লাহ্‌তাআলা সদয় দৃষ্টিতে তাকাবেন না, 'আর প্রত্যেক সে ব্যক্তি যাকে তার জাতি অনুগৃহীত করেছে কিন্তু সে তাদের অনুগ্রহের অমর্যাদা করে তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও সম্পর্কচ্ছেদের ভূমিকা রেখেছে" (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সবার চেয়ে উত্তম চারিত্রিক গুণের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। আমি বললাম, 'যাবো না' কিন্তু আমার অন্তরের এটাই ছিল যে, আমি হুযূরের আদেশ পালনের জন্যে অবশ্যই যাব। মোটকথা, আমি রওনা হলাম এবং বাজারে খেলায় রত ছেলেদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম। ইতোমধ্যে আঁ হযরত (সঃ) পেছন দিক দিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরলেন। আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন। বললেন, 'হে উনায়েস! এক কাজের জন্য যেখানে আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম সেখানে কি গিয়েছিলে?' আমি নিবেদন করলাম, 'হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ্!' হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'খোদার কসম! আমি তাঁর নয় বছর খিদমত করেছি। আমি তাঁকে কখনও এ কথা বলতে শুনি নি, 'তুমি এ কাজ কেন করলে বা সে কাজটি কেন করলে না?' (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)।

অন্য কথায়, হুযূর পাক (সঃ) হযরত আনাসকে খুবই স্নেহ করতেন। যদি কখনও কোন কাজে তিনি অবহেলা বা ভুল-ত্রুটিও করতেন তাহলে আঁ হযরত (সঃ) তা ক্ষমা করে দিতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জা'ফর (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আঁ হযরত (সঃ) যখনই কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন যেমন আহ্‌লে-বায়তের শিশু-কিশোররাও তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে যেতো। একবার যখন তিনি সফর থেকে ফিরে এলেন তখন সবার আগে আমাকে তাঁর কাছে পৌঁছানো হলো। তিনি আমাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর হযরত ফাতেমার (রাঃ) দুই পুত্র হাসান (রাঃ) বা হুসেন (রাঃ)-এর মাঝে কোন একজনকে আনা হলে তাকে তিনি তাঁর পেছনে বসিয়ে নিলেন। এভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় এমতাবস্থায় প্রবেশ করলেন যে, একটি উটের ওপর আমরা তিনজন সওয়ার ছিলাম" (মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)

এখন উটের যুগ তো নেই কিন্তু শিশুদেরকে যে ধরনের যানবাহনই হোক তাতে- এমন কি মোটর কার চালাতে চালাতে কোলে বসিয়ে নেয়া এ-ও সুন্নতে-নবুবী বটে। আমিও শিশুদের ক্ষেত্রে এ সুন্নত পালন করতাম, মোটরকার চালানোর সময়ে আমার ছেলে-মেয়েদেরকে পালাক্রমে কোলে বসিয়ে নিতাম।

একটি হাদীস হযরত উসামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, 'রসূল করীম (সঃ) আমাকে উঠিয়ে তাঁর (সঃ) উরুর ওপর বসিয়ে নিতেন এবং আরেক উরুতে হাসান (রাঃ)-কে বসাতেন। তারপর বুকে জড়িয়ে এ দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি এ উভয়ের সাথে সদয় ব্যবহার করো, আমিও এদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে থাকি' (বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

এরপর 'সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)' গ্রন্থে হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শিশু-সন্তানদের। কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। আর ভ্রমণের সময়েও কোলে তুলে নিতেন। এতে কখনও তিনি সংকোচ বোধ করতেন না। যে খোদ্দাম সাথে থাকতেন

যদিও তারা নিজেরা এদেরকে তুলে নেয়া নিজেদের জন্যে সৌভাগ্য মনে করতেন কিন্তু হযরত (আঃ) শিশুদের আকাঙ্ক্ষার প্রতি অনুভূতির দরুন বা এদের (কোলে ওঠার) আকুতির দিকে লক্ষ্য করে নিজেই উঠাতেন ও এদের ইচ্ছা পূরণ করে দিতেন। তারপর কিছুদূর গিয়ে কোন খাদেমকে দিয়ে দিতেন।' অর্থাৎ প্রথমে নিজে কোলে উঠিয়ে চলতে থাকতেন, তারপর কিছু দূর গিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে কোন একজন খাদেমের নিকট সোপর্দও করে দিতেন। সাহেবযাদী আমাতুন্ নাসীরের মৃত্যুতে তার জানাযাও হুযূর (আঃ) নিজের হাতে বয়ে নিয়ে যান। ছোট বাজার দিয়ে বেরিয়ে টমটমের আড্ডা খানা পর্যন্ত হুযূরই বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন' (সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), ইয়াকুব আলী সাহেব প্রণীত, পৃঃ ৩৮৯)।

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

'বহুবারই দেখেছি, তাঁর (আঃ) নিজের ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য শিশু-কিশোর তাঁর খাটে (বিছানায়) বসে গেছে আর তাঁকে বাধ্য করে খাটের প্রান্তে (পায়ের দিকে) বসিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের বাল্যসূলভ ভাষায় ব্যঙ্গ, কাক ও পাখির গল্প শুনাচ্ছে - যা ঘন্টার পর ঘন্টা গড়িয়ে যাচ্ছে আর ওদিকে হযরত তা বড়ই মজা করে শুনতে থাকেন যেন কেউ 'মসনবী মোল্লা-এ-রূম' পড়ে শুনাচ্ছে। হযরত শিশুদেরকে মার-ধর করা ও শাসানো -ধমকানোর ঘোর বিরোধী ছিলেন। শিশুরা যতই না উত্তেজিত হোক, মুখ বিকৃত করুক, ঔদ্ধত্য দেখাক, প্রশ্ন করে করে বিরক্ত করুক আর অযথা প্রশ্ন করুক এবং কোন কাল্পনিক ও অবাস্তব জিনিস পেতে সীমা ছাড়িয়ে জেদ ধরুক, তিনি (আঃ) তাতে এদের গায়ে হাত তোলেন না, ধমকও দেন না এবং অসন্তুষ্টির কোন আভাসও দেন না" (সীরাত মসীহ্ মাওউদ, পৃঃ ৩৫)।

গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের তরবিয়ত

শিশু-কিশোরদের ভাল ভাল গল্প-কাহিনীও শুনানো উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ 'ভাল কাহিনী শুনিয়ে দেয়া উচিত, এতে কিশোরদের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে' (সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ, ইয়াকুব আলী ইরফানী প্রণীত, পৃঃ ৩৮৪)।

আমিও উর্দূ ক্লাসে কোন কোন গল্প শিশু-কিশোরদের শুনাতাম আবার নিজেও (গল্প) বানিয়ে বানিয়ে শুনাতাম। তারা তাতে খুবই কৌতুহল অনুভব করতো। এভাবে তারা উর্দূও শিখে নিতো। আর আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সুন্নত পালন করারও তৌফীক লাভ করতাম।

সমতা ও ন্যায়-নীতি ভিত্তিক আচরণ করুন

হযরত নো'মান বিন বশীর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে আঁ হযরত (সঃ)-এর খিদমতে নিয়ে যান এবং বলেন, 'আমি আমার এ পুত্রকে একজন কৃতদাস উপহার দিয়েছি।' হুযূর পাক (সঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি তোমার প্রত্যেক পুত্রকে এ রকম উপহার দিয়েছ?' আমার পিতা বললেন, 'না, দেই নি হুযূর!' তিনি বললেন, 'এ উপহার ফেরত নিয়ে নাও।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, হুযূর পাক (সঃ) বললেন, 'আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার সব সন্তানের সাথে ন্যায়-নীতি ও সমতা ভিত্তিক আচরণ কর।'। কাজেই স্মরণ রাখা উচিত, কোন কোন সন্তান মা-বাবার কাছে অধিক প্রিয় হয়ে থাকে কিন্তু যারা কম প্রিয় তাদের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত আচরণ হওয়া আবশ্যকীয়। যদি তারা ন্যায়-বিচার না করেন তাহলে সন্তানদের মধ্যেও কার্পণ্য ও ঘৃণার সৃষ্টি হবে। 'তখন আমার পিতা ঐ উপহার ফেরত নিলেন' (বুখারী, কিতাবুল হিবা)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) শিশু-কিশোরদের (শারীরিক) শাস্তি দেয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। অর্থাৎ শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পক্ষ থেকে এ উপদেশ ছিল ও তাঁর এ কঠোর নির্দেশ ছিল, তারা যেন শিশু-কিশোরদেরকে বেত্রাঘাত না করেন। তা'লীমুল ইসলাম স্কুলের কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যখন কোন শিশু-কিশোরকে মার-ধর করেছেন বলে অভিযোগ আসতো তখন হযরত (সঃ) তা অত্যন্ত অপসন্দ করতেন। তাই ক্রমাগত তাঁর পক্ষ থেকে এরূপ নির্দেশ প্রদান ও কার্যকর করা হয় শিশু-কিশোরদেরকে যেন শারীরিক শাস্তি না দেয়া হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'খোদাতাআলার পক্ষ থেকে যেখানে তাদের ক্ষেত্রে কোন জবাবদিহিতার বিধান নেই সেখানে তোমরা কী করে তাদের জবাবদিহি করতে পার?' [সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব প্রণীত, পৃঃ ৩৬৫]। এর মানে হলো যখন খোদাতাআলার নিকট তাদের জবাবদিহি হবার এখনও বয়স হয় নি তখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে আপনারা তাদের প্রতি কঠোর আচরণ করার বৈধ অধিকারী হতে পারেন না।

'মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল' থেকে একটি হাদীস ঃ হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "একবার আঁ হযরত (সঃ) এলেন। আমি তখন ছেলেদের সাথে খেলছিলাম। তিনি আমাদের সকলকে সালাম দিলেন। আর আমাকে তাঁর এক কাজে পাঠালেন। সে কারণে আমি আমার মায়ের কাছে দেরীতে পৌছলাম। আমার মা আমাকে দেরীতে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি উত্তর দিলাম, আঁ হযরত (সঃ) আমাকে এক কাজের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। আমার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কাজটি কী ছিল?' আমি উত্তর দিলাম, 'একটি গোপন বিষয় ছিল।' আমার মা বললেন, 'তাহলে হুযূরের গোপন বিষয়ের কথা কাউকে জানিও না।' হযরত আনাস (রাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর কর্মচারী সাবেতকে বললেন, 'সে গোপন বিষয়টি যদি আমি কাউকে জানাতে পারতাম তাহলে নিশ্চয় তোমাকে বলে দিতাম" (মুসলিম, কিতাবুল-ফাযায়িল)।

নামাযের উপদেশ

হযরত আমর বিন শোয়ায়েব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদার থেকে বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায় তখন তাদেরকে নামায পড়ার জন্য তাগিদ দিতে থেকো আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যায় তখন নামায না পড়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি কিছু কঠোর হও। কিন্তু এ কঠোরতা অবশ্যই মামুলি হওয়া উচিত, যেমন পিঠের ওপর দুই / একটা থাপ্পড় হালকাভাবে মেরে দেয়া এর বেশি - লাঠি বা বেত ইত্যাদির দ্বারা আঘাত করা কখনও বুঝায় না।ওটা রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কখনও পসন্দ করতেন না। "যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যায় তখন তাদের প্রতি কিছু কঠোর হও এবং এ বয়সে তাদের বিছানা আলাদা করে দাও অর্থাৎ তাদেরকে আলাদা বিছানায় শুতে দাও" (আবূ দাউদ, বাবু মাতা ইউমারুল গোলামু বিস্সালাত)। তাদের বয়স বার বছর হয়ে গেলে আর তাদের প্রতি কোন রকম কঠোরতা অবলম্বন করার অনুমতি নেই।

তারপর তাদের ব্যাপার খোদাতাআলার উপর ছেড়ে দাও। বাল্যকালে তোমাদের দেয়া তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষা তাদের কাজে আসবে, আর কাজে আসবে তোমাদের দোয়া।

সঠিক ধারায় নামায পড়ার প্রশিক্ষণ দেয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমি আমার খালার ঘরে রাত যাপন করি। শেষ রাতে রসূল করীম (সঃ) নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। আমি হুযূরের সাথে তাঁর বাঁ দিকে দাঁড়ালাম। হুযূর (সঃ) আমার মাথায় ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন (বুখারী, কিতাবুল আযান)। অতএব, এ-ও স্মরণ রাখুন, ছেলে (অর্থাৎ পুরুষ) হলে তাদের পক্ষে ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো বিধেয়, আর মেয়েছেলেদের পক্ষে ইমামের বাঁ দিকে।

হুযূর (আইঃ) বলেন ঃ নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে আপনারা ভালবাসবেন বৈ কি তবে স্মরণ রাখবেন, সন্তানদের প্রতি বেশি ভালবাসাও মানুষকে অনেক বড় বড় ফেৎনায় ফেলে দেয়। তাই অধিকাংশ মানুষ নিজ সন্তানকে বেশি ভালবাসার ফলে এদের বিকারগ্রস্থ ও নষ্ট হবারও কারণ হয়ে যায় আর তাই বড় হয়ে এদের কৃতকর্ম ও পাপের জন্য দায়ী হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'নিজ অবস্থার শুভ পরিবর্তন ও নিজের জন্য প্রার্থনার পাশাপাশি নিজ সন্তান ও স্ত্রীর জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত। কেননা মানুষের উপর অধিকাংশ ফেৎনা সন্তানদের কারণে এসে পড়ে" (মলফূযাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪৫৬)।

মা-বাবারা নিশ্চয় চান সন্তানরা যেন সৎ ও পুণ্যবান হয় কিন্তু নিজেদের অবস্থাই তারা পাল্টান না, তার সংশোধন করেন না। তবে শিশুরা অত্যন্ত বিচক্ষণ হয়ে থাকে। তারা বাবা-মায়ের অবস্থার প্রতি লক্ষ্যও করে ও জেনে যায় যে, তারা নিজেরা তো পাপকে ভালবাসেন আর এদেরকে পুণ্যের কথা বলেন। কাজেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ তত্ত্বটি শিখিয়েছেন, যতক্ষণ নিজেদের সংশোধন করবেন না ততক্ষণ শিশু-কিশোরদেরকে কেবল মৌখিকভাবে পুণ্যের উপদেশ দেয়া কোন কাজে আসবে না। তিনি (আঃ) বলেন, "যদি কেউ নিজে অসৎ ও পাপাচারী জীবন যাপন করে আর মুখে বলে, সে সৎ, পুণ্যবান ও মুত্তাকী সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষী তাহলে সে তার এ দাবীতে চরম মিথ্যেবাদী। সৎ পুণ্যবান ও তাকওয়াশীল সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করার আগে কারো পক্ষে নিজেকে সংশোধিত করা ও নিজের জীবনকে তাকওয়ামন্ডিত জীবনে পরিণত করা আবশ্যকীয়। তবেই তার সে আকাঙ্ক্ষা এক স্বার্থক ও ফলপ্রসূ আকাঙ্ক্ষা হিসেবে সাব্যস্ত হবে আর সে সকল সন্তান প্রকৃতপক্ষে বাকিয়াতিস্ সালেহাত - স্থিতিশীল পুণ্যবান বংশধর হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য হবে। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা যদি কেবল এজন্য হয় যে, আমাদের নাম যেন অবশিষ্ট থাকে এবং এরা আমাদের আসবাবপত্র ও সহায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় অথবা অত্যন্ত নাম-ধাম ও খ্যাতি লাভ করে তাহলে এ রকম আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে শির্ক" (মলফূযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৭০-৩৭২)।

হযরত মৌলানা আব্দুল করীম (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন, "তাঁর শিশু-সন্তানদের লালন-পালন ও সযত্ন তত্ত্বাবধান দেখে কোন বাহ্যদর্শী লোক মনে করবে, সন্তানদের প্রতি তাঁর চেয়ে অধিক ভালবাসা হয়তো অন্য কারোই নেই। তাদের কারও অসুস্থতার সময় তার দিকে তিনি এতো মনোযোগ দেন এবং সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় এতো মগ্ন হয়ে পড়েন যেন তাঁর অন্য কোন চিন্তা-ই নেই। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী মানুষ দেখে বুঝতে পারে যে, এসব কিছু কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে তাঁর দুর্বল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও তাদের সযত্ন লালনই হলো তাঁর লক্ষ্য। তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা ইসমাত লুধিয়ানায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে ওষুধ-পত্র দেয়ার ব্যাপারে এমনভাবে তৎপর হয়ে পড়েন যেন সে ছাড়া তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাই দায় এবং দুনিয়ার পরিভাষায় কোন সন্তান-আসক্ত ও সন্তান পুজারী ব্যক্তি (সন্তান সেবায়) এর চেয়ে বেশি প্রাণান্তর ভূমিকায় আত্মমগ্ন হতে পারে না। কিন্তু (শিশু) ইসমত যখন মারা গেলো তখন তিনি (আঃ) দৃশ্যপট থেকে এমনভাবে সরে পড়লেন যেন কন্যা বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না, আর সেই থেকে তার কথা কখনও আর উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি" (সীরাত হযরত মসীহ্ মাওউদ, হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটী প্রণীত পৃঃ ৫৩)।

হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর তরবিয়ত-পদ্ধতি

এখন হযরত ফুফুজান নওয়াব মুবারেকা বেগম সাহেবা হযরত আম্মাজান সৈয়্যদা নুরজাহান বেগম সাহেবা (রাঃ)-এর তরবিয়ত সম্পর্কিত কিছু মূল নিয়ম-নীতি বর্ণনা করেন যা প্রকৃতপক্ষে আপনাদের জন্য চিরকালই মৌলিক পথ-নির্দেশনার কাজ করবে। এ পদ্ধতিতেই আপনারা যদি আপনাদের সন্তানদের তরবিয়ত করেন তাহলে তারা বড় হয়েও সৎ ও পুণ্যবান থাকবে। তিনি বলেন ঃ "নীতিগত তরবিয়তের ক্ষেত্রে আমার এ বয়স পর্যন্ত আমি সর্বসাধারণ ও বিশেষ লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যলোচনা করেও হযরত আম্মাজান (রাঃ)-এর চেয়ে উত্তম আর কাউকে খুঁজে পাই নি। তিনি আনুষ্ঠানিক জাগতিক শিক্ষা লাভ করেন নি...। কিন্তু নৈতিক চরিত্র ও তরবিয়ত সম্পর্কিত তাঁর অনুসৃত যাবতীয় নিয়মনীতির প্রতি লক্ষ্য করে আমি এটাই মনে করি যে, খোদাতাআলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিবিড় তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার স্পর্শ ছাড়া অন্য কোথায়ও তিনি এসব শিখিয়েছিলেন, তা বলা যায় না।"

"শিশুদের উপর সর্বদা আস্থা রাখা ও খুব দৃঢ় ও গভীর আস্থা প্রকাশ করে তাদের মনে বাবা-মায়ের এ আস্থার লাজ রক্ষার ও এর মর্যাদা বজায় রাখার অনুভূতি সঞ্চার করে দেয়া- এ ছিল তাঁর তরবিয়তের প্রধান নীতি। অতএব শিশু-সন্তানদের প্রতি আস্থা রাখুন। তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবেন না। যদি তারা কোন ভুল কাজেও রত থাকে তবুও তারা আপনাদের আস্থার দৃষ্টির অধীনে সংশোধিত হয়ে যাবে এবং তাদের প্রতি যে আস্থা রাখা হয় তা ভেবে তারা আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে আপনাদেরকে মিথ্যা তথ্য দেয়ার চেষ্টা করবে না।

"মিথ্যার প্রতি ঘৃণা"- এ হলো তরিয়তের গোড়ার কথা। শৈশবকাল থেকেই মিথ্যার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করা অতি আবশ্যকীয়। "আমাদেরকেও তিনি সব সময় এটা বলেছেন, 'শিশুদের কথা মানার অভ্যাস রপ্ত করিয়ে দাও, তারপর বাল্যসুলভ দুষ্টামি হতে থাকলেও কোন ভয় নেই। তাদের সব দুষ্টোমি সহ্য করে নিলেও মিথ্যাকে সহ্য করবে না। যখনই এথেকে তাদের বারণ করা হবে, তাৎক্ষণিক তারা বিরত হবে এবং সংশোধিত হয়ে যাবে।" তিনি বলতেন, একবারও কথা মানার অভ্যাস পাকাপোক্ত করে দিতে পারলে এরপর সবসময় সংশোধনের আশা আছে। এটাই তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছিলেন।

আমরা কখনও ভাবতেও পারতাম না, মাতা-পিতার অনুপস্থিতির অবস্থায় আমরা তাঁদের ইচ্ছার বিরোধী কোনও কিছু করতে পারি তা আমরা কখনও ভাবতেও পারতাম না।

হযরত আম্মাজান (রাঃ) সর্বদা বলতেন, "আমার সন্তানরা কখনও মিথ্যা বলে না। আর এ আস্থাটুকুই আমাদেরকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করতো, বরং মিথ্যার প্রতি আরও ঘৃণা সৃষ্টি করতো।"

আমিও এ ব্যবস্থা-পত্রটি আমার কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখেছি। অনেক গুরুত্ব ও যত্নের সাথে শৈশবকাল থেকেই আমি মিথ্যার প্রতি তাদের ঘৃণা করার অভ্যাস করিয়ে দিই। হুযূর (আঃ) বলেন, সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র তিনি আমার মেয়েদের মাঝে শৈশবকাল থেকেই মিথ্যার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন, ফলে তারা কখনও মিথ্যা বলে না তারা কখনও মিথ্যা বলে কমপক্ষে তা আমার জানা নেই।

হযরত আম্মাজান কখনও কঠোর আচরণ করেছেন বা কথা বলেছেন হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবার তা মনে পড়ে না। তিনি বলেন, আমার জানা মতে কখনও তিনি (রাঃ) কঠোর হন নি, কিন্তু তাঁর বিশেষ এক প্রতাপ ছিল, সে প্রতাপ আমাদের ওপর ছেয়ে থাকতো। সে প্রতাপের প্রভাবাধীন আমরা নিজেদের সংশোধনে সচেষ্ট থাকতাম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত আম্মা জানকে অনেক কদর করতেন, মর্যাদা দিতেন। এর ফলশ্রুতিতে সন্তান-সন্ততির মাঝেও তাঁর প্রতি অসাধারণ কদর ও মর্যাদাবোধ ছিল।

হযরত আম্মাজানের (তরবিয়ত সংক্রান্ত) পঞ্চম মূল-নীতি যা হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবা (রাঃ) বর্ণনা করেন তা হলো ঃ "প্রথম সন্তানের তরবিয়তের ওপর পুরোপুরি জোর লাগাও, পরবর্তী অন্যেরা যাতে তাদের নমুনা ও দৃষ্টান্ত দেখে নিজেরাই ঠিক হয়ে যায়" (সীরাত হযরত আম্মাজান-মাহ্‌মুদ আহমদ ইরফানী প্রণীত)।

এরপর, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। তিনি বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বলেন, "তিনটি দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেইঃ মযলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পুত্রের (সন্তান) জন্য পিতার দোয়া" (ইবনে মাজা, কিতাবুদ্‌দুয়া)।

কু-দৃষ্টির প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য আঁ হযরত (সঃ)-এর একটি দোয়া

হুযূর (আইঃ) বলেন, মায়েরা শিশুদের সম্পর্কে ভাবে তাদের নজর লেগে যাবে বা অমুক ব্যক্তির কুদৃষ্টি তাকে গ্রাস করবে। এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সঃ)-এর একটি দোয়া আপনারা স্মরণ রাখবেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) হযরত হাসান ও হুসেনের জন্য এ দোয়ার মাধ্যমে করতেন আর বলতেন, 'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাকের (আঃ) জন্য এভাবে আল্লাহ্‌তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ (হুযূর বলেন, যদি আরবী শব্দগুলো মনে রাখতে নাও পারেন, এর অর্থ স্মরণ রাখুন)। অর্থ ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের মাধ্যমে শয়তান ও কষ্টদায়ক জীব-জন্তু থেকে তাঁর আশ্রয় চাই এবং কু-নজর (এর অনিষ্ট) থাকেও" (সহী বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

"প্রথম, ... নিজের জন্য দোয়া করি, খোদাতাআলা যেন আমার মাধ্যমে সে কাজ গ্রহণ করেন যদ্বারা তাঁর সম্মান, মর্যাদা ও জালাল প্রকাশিত হয়, আর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পুরোপুরি তওফীক যেন আমাকে দান করেন।

দ্বিতীয়, ... তারপর নিজ পরিবার ও স্ত্রীর জন্য দোয়া করি, তাদের পক্ষ থেকে যেন চোখের স্নিগ্ধতা লাভ হয় এবং তারা আল্লাহ্‌তাআলার যাবতীয় সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হতে থাকে।

তৃতীয়, ... তারপর আমার সন্তানদের জন্য দোয়া করি, তারা সবাই যেন দীনের একনিষ্ঠ সেবক হয়।

চতুর্থ, ... তারপর আমার নিষ্ঠাবান বন্ধুদের জন্য তাদের প্রত্যেকের নাম নিয়ে নিয়ে দোয়া করি।

পঞ্চম,... তারপর এ সিলসিলার সাথে যারা সম্পর্কযুক্ত, আমার জানা ও অজানা তাদের সকলের জন্য (দোয়া করি)"। (আল হাকাম, ১৭ জানুয়ারী, ১৯০০ইং, ৪র্থ পর্ব পৃঃ ২)

এ হলো দোয়ার সে পদ্ধতি যা আমি নিজেও সবসময় অনুসরণ ও অনুশীলন করি এবং আমার সাধ্যানুযায়ী ব্যক্তি বিশেষদের নাম ধরে অথবা সমষ্টিগতভাবে সকলকে আমি দোয়ায় স্মরণ রাখি। আপনজনদের জন্যও, অপরাপরের জন্যও এবং অপরিচিতদের জন্যও দোয়া করি। আপনারা এ পদ্ধতিটি আত্মস্থ করুন। যদি আপনারা এটি নিজেরা অনুসরণ করেন তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ আপনাদেরকে সর্বোত্তমরূপে তরবিয়ত দেয়ার তওফীক দান করা হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মলফূযাত থেকে এ শেষ উদ্ধৃতিটি উপস্থাপন করছি ঃ

"যদি তোমরা চাও যেন সুখে থাক এবং তোমাদের ঘরে শান্তি থাকে তাহলে বেশি বেশি দোয়া কর সমীচীন নিজেদের বাড়ী-ঘর দোয়ায় ভরপুর কর। যে বাড়ীতে সবসময় দোয়া করা হয় খোদাতাআলা তা ধ্বংস হতে দেন না" (মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৩২)।

এখন ভাষণ সমাপ্ত হলো। এবার আমি আপনাদের কাছে অনুমতি চাইবো, কিন্তু যাবার আগে দোয়ার বিষয়ে কথা শেষ হয়েছিল, কাজেই দোয়া করেই আমরা এ ভাষণ শেষ করবো। এরপর হুযূর সমবেতভাবে দোয়া করান।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০১ইং

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আখবারে আহমদীয়া

ওকীলে আলা তাহরীকে জাদীদের সর্বশেষ সার্কুলার মারফত জানা গিয়েছে যে, হুযূর (আইঃ)-এর এনজিওপ্লাষ্ট করার পরে হুযূর (আইঃ)-এর ব্লাড প্রেশার ও সুগার বাড়ছে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার দিকে যাচ্ছে।

হুযূর (আইঃ)-এর পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্যে জামাতের বন্ধুগণকে দোয়া জারী রাখার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- নির্বাহী সম্পাদক

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(২২তম কিস্তি)

ঘুমুতে যাওয়ার দোয়া

♦ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঘুমাবার সময়ে এ দোয়া করতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَ الْمَاْثَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ۔ (ابوداؤد کتاب الادب)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবি ওয়াজহিকাল কারীমি ওয়া কালিমাতিকাত্তাম্মাতি মিন শাররি মা আন্‌তা আখিযুন বিনাসিয়াতিহী- আল্লাহুম্মা আন্‌তা তাকশিফুল মাগরামা ওয়াল মা'সামা আল্লাহুম্মা লা ইউহ্‌যামু জুনদুকা - ওয়ালা ইউখলাফু ওয়া'দুকা - ওয়া লা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা -আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার সম্মানীত সত্তার আশ্রয়ে আসছি আর এমন সব অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই যা তোমার তকদীরের কব্জায় রয়েছে। হে আল্লাহ্! তোমার সৈন্যদেরকে পিছে হটানো হয় না আর তোমার অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করা হয় না। আর কোন বুযূর্গের বুযূর্গী তোমার মোকাবেলায় কোন কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি তোমার প্রশংসাসহ পবিত্র।

♦ হযরত আবূল আযহার (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বিছানায় যাওয়ার সময়ে দোয়া পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ، وَضَعْتُ جَنْبِیْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ ذَنْبِیْ، وَ اَخْسِأْ شَيْطَانِیْ، وَ فُكَّ رِهَانِیْ، وَاجْعَلْنِیْ فِی النَّدِیِّ الْاَعْلٰی۔ (ابوداؤد کتاب الادب)

(বিস্‌মিল্লাহি ওয়া যা'তু যাম্বী আল্লাহুম্মাগফিরলী যাম্বী - ওয়াখসি শায়তানী ওয়া ফুক্কা রিহানী-ওয়াজ 'আলনী ফীন্নাদিঈল আ'লা - আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে আমি আমার পার্শ্ব (বিছানায়) রাখছি। হে আল্লাহ্! আমার পাপ ক্ষমা করো। আমার শয়তানকে বিফল করে নিজের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ পালন করার সৌভাগ্য দাও আর আমাকে ফিরিশ্‌তাদের মজলিসে স্থান দান করো।

ঘুম থেকে জেগে দোয়া

♦ হযরত হুযায়েফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জেগে এ দোয়া পাঠ করতেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

(আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়াইনা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন্‌নুশূর - বুখারী কিতাবুদ্ দাওয়াত)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেবার পরে জীবিত করেছেন আর তাঁর দিকে উঠে ফিরে যেতে হবে।

♦ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ঘুম থেকে জেগে এ দোয়া করো ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ فِیْ جَسَدِیْ وَرَدَّ عَلَیَّ رُوْحِیْ، وَ اَذِنَ لِیْ بِذِكْرِهٖ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী'আফানী ফী জাসাদী ওয়া রদ্দা আলায়য়্যা রূহী-ওয়া আযিনা লী বিযিক্‌রিহী - তিরমিযী, কিতাবুদ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার শরীরকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করেছেন আর আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর স্মরণের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

♦ হযরত আবাদা (রাঃ) বিন আসামত বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি রাতে হঠাৎ ঘুমের ঘোরে ভয় পেয়ে ওঠে তখন এ বাক্য পাঠ করে কোন দোয়া করলে খোদাতাআলা তা গ্রহণ করে থাকেন। এরপরে যদি সে ওযূ করে নামায পড়তে দাঁড়ায় তাহলে তা-ও বিশেষ গ্রহণীয়তা লাভ করবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

♦ **(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বদীর - ওয়াল হামদুলিল্লাহি সুবহানাল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুয়াল্লাহু আকবর-ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ -আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী** - বুখারী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন্ উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। সকল আধিপত্য তাঁরই এবং সকল প্রশংসাও তাঁরই আর তিনি সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান। এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি পবিত্র এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তিনিই। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর।

♦ হযরত বারীদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালীদের অনিদ্রা রোগের অভিযোগের ওপরে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁকে রাতে এ দোয়া পড়া শিখিয়ে দেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَ مَا اَظَلَّتْ، وَ رَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَ مَا اَضَلَّتْ، كُنْ لِیْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا، اَنْ يَّفْرُطَ عَلَیَّ اَحَدٌ، اَوْ اَنْ يَّبْغِیَ عَلَیَّ، عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা রব্বাস্‌সামাওয়াতিস্ সাব'ই ওয়ামা আযাল্লাত-ওয়া রব্বাল আরযীনা ওয়ামা আক্বল্লাত- ওয়া রব্বাশ্ শায়াত্বিনী ওয়ামা আযাল্লাত - কুন লী জারান মিন শার্‌রি খলাক্বিকা কুল্লিহিম জামি আঁইয়াফরুত্ত্বা 'আলায়্যা আহাদুন - আও আঁইবাবগিয়া আলায়্যা - 'আয্‌যা জারুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা - ওয়া লা ইলাহা

গয়রুকা - লা ইলাহা ইল্লা আনতা - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্। সাত আকাশ ও তার ছায়ায় প্রত্যেক বস্তুর প্রভু-প্রতিপালক! আর সাত পৃথিবী ও এর ওপরে যা কিছু বসবাস করছে তার প্রভু-প্রতিপালক! শয়তানসমূহ ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্ট সত্তাসমূহের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তোমার সব সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমার আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়ে যাও যেন আমার ওপরে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন না হয়। তোমার আশ্রয় সম্মানের হয়ে থাকে আর তোমার প্রশংসা উচ্চ এবং তুমি ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই অবশ্যই তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

স্বপ্নে ভয় পেলে দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি কেউ ঘুমের ঘোরে ভয় পায় তাহলে এ দোয়া পাঠ করলে তার কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) নিজের সন্তানদের এ দোয়া মুখস্থ করাতেন। তদুপরি মালেক (রাঃ) বিন আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, খালেদ (রাঃ) বিন ওয়ালীদ ঘুমের ঘোরে ভয় পেতেন। তাঁকে (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়া শিখান ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

(مؤطا امام مالک کتاب الجامع)

(আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি মিন গযাবিহী ওয়া শাররী 'ইবাদিহী -ওয়া মিন হামযাতিশ্শায়ত্বানি ওয়া আঁইয়াহ্যুরূন - (মুয়াত্তা ইমান মালেক, কিতাবুল জাম'ঈ)

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ ও পরম কথার আশ্রয়ে আসছি। তাঁর গযব ও আযাব থেকে তাঁর বান্দার অনিষ্ট থেকে। শয়তানী প্ররোচনা থেকে আর এ কথা থেকেও যে, আমাকে এ সবের সম্মুখীন হতে হয়। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

আধুনিক মরণ

মানুষ যখন জীবনে মানবতাবোধ তথা বিবেক বুদ্ধিকে চেপে রাখে বা বিদায় দেয় তখন সে কতো জঘন্য হতে পারে এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত ২৫.৮.০২ তারিখের খবরটি ঃ

প্রতিপক্ষকে মামলায় জড়াতে দুই শিশু কন্যাকে হত্যা করেছে পিতা

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের ধোবড়া গ্রামে পিতা কর্তৃক দুই শিশুকন্যাকে নৃশংসভাবে গলা টিপে হত্যার মোটিভ বেরিয়ে এসেছে। ঘাতক পিতা আবদুল মান্নান প্রতিপক্ষ একই গ্রামের নুরুল, কুদ্দুস ও আফসারকে হত্যা মামলা দিয়ে ঘায়েল করার মানসে রুকসানা (৭) ও রুনাকে (৫) হত্যা করে। অপর এক শিশু কন্যা ও স্ত্রী চামেলীকেও হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু পর পর দুই কন্যাকে হত্যার দৃশ্য দেখার পর কয়েকমাসের শিশুকন্যাকে কোলে নিয়ে স্ত্রী ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

দুটো নিষ্পাপ শিশু যারা মালি-মোকদ্দমার কিছুই বোঝে না তাদের অমূল্য জীবন হনন করালো তাদেরই পিতা যা ভাবতেও অবাক লাগে!

বর্তমান বিশ্বে এরূপ বিবেক-বুদ্ধি-হীন কর্মকান্ড যে বেড়ে চলেছে বোধ হয় বিনা দ্বিধায় বলা চলে। ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ দেহ থেকে তা দূর করতে মহাপুরুষ তথা নবী-রসূলের শুভাগমন একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ বিশ্বব্যাপী সেই শুভ বার্তাই ছড়িয়ে দিচ্ছেন। হে আল্লাহ্, তুমি এ জামাতের একান্ত সহায় হও।

ভাইকে লুকিয়ে রেখে বাবার কাছে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী

দুই ভাই এখন কারাগারে

অপহরণের কাহিনী সাজিয়ে বাবার কাছ থেকে কৌশলে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করতে গিয়ে রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়া এলাকার দুই সাহোদর রিপন (২৩) ও জুয়েল (১৮) এখন কারাগারে। দুই ভাইয়ের এই অপরাধ কাহিনী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

গার্মেন্টস কর্মী রিপন ও জুয়েলের বাবা আলাউদ্দিন একজন ব্যবসায়ী। তাদের বাসা ১০০১/৬ নম্বর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায়।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এন্তেজার রহমান জানান, গত ৬ সেপ্টেম্বর তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মৌখিকভাবে জানানো হয়, জুয়েলকে অপহরণ করা হয়েছে। পরদিন খবর আসে অপহরণকারীরা ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে। পুলিশ এই সংবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে খোঁজ-খবর নিয়ে রহস্যের গন্ধ পায়।

জুয়েলের বাবা পুলিশকে জানান, অপহরণকারীরা পর পর তিন দিন ১ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবীতে রিপনের কাছে তিনটি চিঠি দিয়ে গেছে। পুলিশের কাছে রিপনের কথাবার্তা সন্দেহজনক মনে হয়। গত রোববার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, রিপন নিজেই জুয়েলকে রামপুরার মহানগর প্রজেক্টে এক বাসায় লুকিয়ে রেখেছে। সংবাদ পাওয়া মাত্রই পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে দুই ভাইকে এক ঘর থেকে গ্রেফতার করে। বাবার কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্য রিপন নিজ হাতে কৌশল করে এই চিঠি লিখেছেন বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

খিলগাঁও থানা সূত্র জানায়, রিপন ও জুয়েল এলাকায় বখাটে হিসেবে পরিচিত। গত ৩ আগস্ট তারা আশরাফ নামে এক প্রতিবেশীর কাছেও তিন দফা চিঠি লিখে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। টাকা না পেলে তারা আশরাফের ছেলে ফারুকুজ্জামান অপুকে অপহরণ করবে বলে চিঠিতে হুমকি দিয়েছিল।

১০.৯.০২ তারিখে প্রথম আলোতে প্রকাশিত খবরটি হলো ঃ

কলির যুগে পতিত মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তিতে কতো পলিত ময়লার আবরণও পড়েছে এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো উল্লেখিত খবরটি। এদের কাছে মা-বাপ,

ভাই-বোন সবকিছুর চেয়ে বড় হলো অর্থ। কীভাবে, কোথা থেকে অর্থ আসলো তা ভেবে দেখার কোনই গুরুত্ব নেই এদের কাছে। এরা খরচের কুপথই ধরে থাকে। গ্রাম্য কথায় বলা হয়, যে নালে উৎপত্তি সে নালে বিনাশ।

১৯.২.০২ তারিখে প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'মর্মান্তিক' খবরটি হলো ঃ

মর্মান্তিক

যশোর অফিস ঃ ১৯.২.০২ বার বার কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ায় স্বামীর তিরস্কারে অতিষ্ঠ মর্জিনা খাতুন (৪) তার দু'মাস বয়সী শিশুকন্যা আঁখিকে বটি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করেছে। যশোরের সদর উপজেলার দৌলতাদহী গ্রামে গত রোববার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। গ্রামবাসী সন্তারক মাকে ধরে পুলিশে দিয়েছে।

পুলিশ ও গ্রামবাসী সূত্রে জানা যায়, পরপর চারটি কন্যাসন্তান হওয়ায় স্বামী মনিরুজ্জামান মর্জিনাকে প্রায় তিরস্কার করত। এ নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগে থাকে।

গত রোববারও এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বাধে। এর রেশ ধরে মর্জিনা তার শিশুসন্তান আঁখিকে নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের বাগানে নিয়ে বঁটি দিয়ে সাত টুকরা করে। এরপর সে উন্মাদ হয়ে শিশুর খন্ডিত টুকরোগুলো আঁচলে জড়িয়ে মসজিদে নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় গ্রামবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে অকপটে ঘটনা স্বীকার করে বলে, 'আমি আল্লাহ্‌র ঘরে মাফ চাইতে যাচ্ছি।' এরপর গ্রামবাসীরা তাকে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়েছে। মর্জিনাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক বিজ্ঞান মতে মানব সন্তানের লিঙ্গ নির্দ্ধারণে স্ত্রীর কোনই অবদান থাকে না- এ বিষয় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। ছেলে হবে না মেয়ে হবে তা একান্তভাবে স্বামী তথা পুরুষের উপর নির্ভর করে। এজন্য কাকেও শাস্তি দেয়া নিরর্থক। এজন্য কোন স্বামীর বিন্দুমাত্রও অধিকার নেই একই স্বামী-স্ত্রীর সন্তান শুধু মেয়ে বা ছেলে বা কেউ মেয়ে বা কেউ ছেলে হতে পারে। বড়ই পরিতাপের বিষয় অজ্ঞতার দরুন কাকেও হত্যা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। এতে অজ্ঞতারই প্রসার ঘটানো হয়।

৩১.১০.৯৯ তারিখের পত্রিকাটিতে বলা হয়েছিলো মানুষের গড় আয়ু ১২০ বছর হবে। তেমনি ১৬.১ ২০০০ তারিখে বলা হয় গড় আয়ু ১২৫ বছর হবে।

মানুষের গড় আয়ু হবে ১২৫ বছর

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির বদৌলতে সারা বিশ্বের বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর মানুষের আয়ু বাড়ছে। ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর। ১৯৯৯ সালে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬ বছরে দাঁড়িয়েছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার, বিশেষ করে তিন প্রকৌশলের অগ্রগতির ফলে মানুষ আরও দীর্ঘায়ু হয়ে উঠবে। বলা যায়, বার্ধক্য বিলম্বিত হবে। মানুষ অনেক দেরি করে বুড়ো হবে।

মানুষকে দীর্ঘায়ু করে তোলার ব্যাপারে জিন প্রকৌশলীদের চেষ্টার শেষ নেই। ইতোমধ্যে তাঁরা জেনেটিক রূপান্তর ঘটিয়ে এক জাতীয় ফলের মাছির আয়ু এক-তৃতীয়াংশ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের ক্ষেত্রেও জেনেটিক রূপান্তর তাদের আয়ু বাড়তে সহায়ক হবে। ২০৫০ সাল নাগাদ এক শ' বছর কি তারও বেশি আমেরিকান নর-নারীর সংখ্যা সাড়ে ৮ লাখে পৌঁছতে পারে। আর ২১০০ সাল নাগাদ আমাদের বংশধররা ২শ' বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কিছু কিছু বিজ্ঞানী। তাঁদের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, বিজ্ঞান একের পর এক রোগব্যাধিকে জয় করে জরাকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী শতাব্দীতে মুলিকুলার বায়োলজিষ্টরা হয়ত আমাদের জিনরহস্যের নতুন জট খুলে দেবেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা হয়ত মূল কোষ (Stemell) থেকে নতুন হৃৎপিন্ড, নতুন লিভার এমনকি আর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করতে সক্ষম হবেন। তখন হয়ত দীর্ঘায়ু এ সীমানাও অতিক্রম করে কোথায় যাবে এর কিছু সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। একটি বিষয়ের উল্লেখ করলেই উপলব্ধি করা যাবে যে, শুধু বিজ্ঞানের বলে এসব অগ্রগতি বজায় রাখা যাবে না। বরং বিজ্ঞানের সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সংযোগ ও সমন্বয় ঘটাতেই হবে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বাস হলো, ধর্ম আল্লাহ্‌র বাণী আর বিজ্ঞান হলো আল্লাহ্‌র কর্ম। সর্বশক্তিমান একই অস্তিত্বের কথা ও কর্মে কখনও অমিল থাকতে পারে না। যেভাবে নিষ্পাপ শিশুদের খুন করা হচ্ছে তাতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বয়সের উচ্চ গড় তুচ্ছ হয়ে যাবে তাছাড়া নকল ঔষধ পত্তর জীবন ও জীবনী শক্তির হানী ঘটায় সাধারণভাবে খুন খারাবিও বেড়ে চলেছে যা জীবনে বাঁচার গড় হ্রাস করছে।

- মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

(২০তম কিস্তি)

হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত বা মৃত্যু

সন্তান ঃ আপনি প্রত্যেক বিষয়ে এমন অসাধারণ কথা বলে দিয়ে থাকেন যা স্কুলে কেউ মানতে চায় না। যেমন আমি বলি, হযরত ঈসা (আঃ) মারা গেছেন। তখন কেউ আমার কথা মানে না- মুসলমানরাও না আর খৃষ্টানরাও না। একটি ছেলে তো এ কথাও বলছিলো যে, আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন অথচ তোমাদের নবী মাটিতে সমাহিত।

মা ঃ কথা শুরু করার আগে যদি তুমি কয়েকটা দলীল মুখস্থ করে নাও এবং কুরআন পাক ও পবিত্র হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলো তাহলে কম শিক্ষিত লোকদের অন্তরে সৃষ্ট কিস্‌সা-কাহিনী তোমাকে অস্থির করতে পারবে না।

সন্তান ঃ আপনি সবার আগে কুরআন পাক থেকে এমন দলীল বলুন যার আগে কোন কথা হতে পারে না।

মা ঃ হযরত ঈসা (আঃ) ও আমাদের মত মানুষ ছিলেন। খেতেন ও পান করতেন। ঘুমুতেন ও জাগতেন। আনন্দিত হতেন ও দুঃখ পেতেন। তাঁর ওপরে খোদাতাআলা প্রবর্তিত সকল মানবিক নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হতো। জীবনের জন্যে কুরআন পাক একটি নীতি বর্ণনা করেছেন ঃ

ফীহা তাহইয়াওনা ওয়া ফীহা তামুতূনা অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতেই জীবন কাটাবে আর পৃথিবীতেই মারা যাবে (সূরাতুল আ'রাফ ঃ ২৬)।

এর অর্থ এই যে, জীবন ও জমীন অর্থাৎ Life ও Earth পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। কেউ কি বলতে পারে, হযরত ঈসা (আঃ) মারা যান নি জীবিত আছেন। তাহলে তিনি কোথায়? খোদাতাআলা তাঁর বিধানকে ভঙ্গ করেন না। জীবনের জন্যে বায়ু, পানি, খাদ্য সবই জমীন থেকে পাওয়া যায়। যেখানে এসব নেই সেখানে জীবনও নেই।

সন্তান ঃ এভাবে তো তাঁকে মৃত সত্তা বলে স্বীকার করতেই হবে।

মা ঃ কুরআন পাকের একটি আয়াত;

কুল্লু নাফসিন যাইক্বাতুল মওত

অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে (সূরাতুল আনকাবূত ঃ ৫৮)।

সন্তান ঃ আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও তো কুরআন পাক থেকে তাঁর (আঃ) আকাশে যাওয়া প্রমাণ করে থাকেন। তারা বলেন, কুরআন পাকে লেখা আছে **রাফা'** হয়ে গেছেন। উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

মা ঃ কুরআন পাকে এসেছে ঃ

ইয়্যা ঈসা ইন্নী মুতাওওয়াফ্ ফীকা ওয়া রাফি'উকা

ইলায়্যা অর্থাৎ হে ঈসা! নিশ্চয় আমি তোমাকে মৃত্যু দিব আর আমার দিকে তোমার রাফা' করব (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ৩৬) রাফা' শব্দের অর্থ মর্যাদায় উন্নীত করা।

মা ঃ কিন্তু নিরক্ষর লোকেরা বলে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদা আকাশে নিয়ে গেছেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার আসবেন। সারা বিশ্বের সংশোধন করে পরে তিনি মারা যাবেন।

মা ঃ তুমি কেবল এটা দেখো যে, কুরআন পাক কী বলে। কুরআন পাক স্পষ্ট করে বলেছে, ঈসা (আঃ) -কে ওফাত দেয়া হয়েছে। পরে তাঁর মর্যাদা উন্নীত করা হয়েছে। যদি তুমি রাফা' শব্দের অর্থ আকাশে নেয়া করো তাহলে দু' সিজদাহ্‌র মাঝে যে দোয়া তুমি পড়ে থাকো এতে রয়েছে 'ওয়ারফা'নী তাহলে এর অর্থ কি আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে?

সন্তান ঃ না, এর অর্থ এই যে, আমাকে সম্মান দান কর।

মা ঃ এখন তুমি বিষয়টি বুঝতে পেরেছো যে, রাফা' শব্দের অর্থ সম্মান দেয়া। সম্মানের সাথে শেষ শুভ পরিণতি ঘটানো।

সন্তান ঃ কুরআন পাকে আল্লাহ্‌তাআলা কেন একথা বলছেন যে, আমি ঈসা (আঃ)-কে ওফাত দিয়েছি এবং সম্মানের সাথে নিজের কাছে ডেকেছি।

মা ঃ যেহেতু ইহুদীদের ধর্মীয় বিশ্বাস এই যে, যে ব্যক্তিকে ক্রুশে দেয়া হয় সে লানতী (অভিশপ্ত)। আর তারা এজন্যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে দিয়ে মারতে চেয়েছে (তারা তওরাত অনুযায়ী এটা প্রমাণ করতে পারে) যে, এ ব্যক্তি যে নিজেকে নিজে খোদার নবী বলছে সে নবী নয় বরং পাপী। এজন্যে তারা এ কথাকে প্রমাণ করার জন্যে নিজেরা সিদ্ধান্ত করে নেয়। কিন্তু খোদাতাআলাও তাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা চালান যে, এ আমার পুণ্যবান বান্দা আমার নবী। আমি তাকে এ অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করবো। সুতরাং যিনি তাকে ক্রুশ থেকে জীবিতাবস্থায় নামান। তার হাওয়ারী (মান্যকারী) তাকে মরহমে ঈসা দিয়ে চিকিৎসা করেন। যখন তিনি আরোগ্য লাভ করেন তখন খোদাতাআলার আদেশে কাশ্মীরের দিকে হিজরত করেন। কেননা, ইহুদীদেরকে খোদার বাণী শুনানো ছিলো তাঁর কাজ। আর ইহুদীদের কোন কোন গোত্র হিজরত করে আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করতো। তিনি তাদের নিকট খোদার বাণী পৌছাতে ও তওরাতের শিক্ষার ওপরে আমল করবার জন্যে চলে যান। সেখানে তিনি খোলাখুলিভাবে তবলীগ করেন ও ১২০ বছর বয়সে ওফাত পান। এ এলাকার লোকেরা তাঁকে 'শাহজাদা নবী' হিসেবে ডাকতো। তাঁর কবর শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় আছে। এভাবে খোদাতাআলা কুরআন পাকে ইহুদীদের এসব চেষ্টা-প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন।

সন্তান ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর হিজরতের উল্লেখ কুরআন পাকে রয়েছে কি?

মা ঃ অবশ্যই রয়েছে। কুরআন করীমই একমাত্র কিতাব যা খোদার কথা। আর সাথে সাথেই তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের ব্যাপারে যেসব ত্রুটিপূর্ণ কথা মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে ওগুলোর অপনোদন করে। ওগুলো থেকে মুক্ত করে এবং সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করে যে, আসল ঘটনা কী ঘটেছিলো। সমস্ত জাতির ও সমস্ত ধর্মের ওপরে এটা কুরআন করীমের বড়ই অনুগ্রহ। তাদের নবীদের কুরআন করীম সাফাই গেয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন,

ওয়াজাআলনাব্‌না মাবাইয়ামা ওয়া উম্মাহূ ওয়া আওইনাহুমা ইলা রাবওয়াতিন যাতি ক্বারারিওঁয়া মা'ঈন অর্থাৎ আমরা ইবনে মরিয়ম ও তাঁর মাকে নিদর্শন বানিয়েছি আর তাদের উভয়কে এক উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় দিই যা আরামপ্রদ ও ঝরণাবাহিত ছিলো (সূরাতুল মু'মিনূন ঃ ৫)।

এখন কাশ্মীরের অঞ্চলের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবে তা অবিকল এমনই জায়গা যেভাবে খোদাতাআলা বলেছেন (চলবে)।

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

প্রসঙ্গ ঃ রোযা

রোযা কী?

ইসলামী ইবাদতের দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ স্তম্ভ হলো রোযা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'যে ধর্মে সাধনা নেই সে ধর্ম আমাদের নিকট কোন মূল্য রাখে না' (ফাতাওয়া আহমদীয়া, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

শরীয়তের পরিভাষায় ফজরের উদয় (সুব্হে সাদিক) থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়্যতে খাওয়া, পান করা ও যৌন কর্ম থেকে বিরত থাকার নাম রোযা বা সওম। সওম বা রোযার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে বলেন, অর্থাৎ রাতে খাও এবং পান কর এমন কি তোমাদের নিকট সাদা সূতা কালো সূতা থেকে আলাদা দৃশ্যমান হয় অর্থাৎ খুব অন্ধকারের পরে পরে ফজরের উদয় হয়। এরপরে রাত আসা পর্যন্ত সারা দিন রোযা পূরো করতে ব্যাপৃত থাকো (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৮৮)। খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে খাবার পানীয় ও যৌন প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকার আদেশ প্রত্যেক প্রকারের খারাপ কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার চিহ্ন। যেভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা বলা ও এ ধরনের কাজ-কর্ম পরিত্যাগ না করে তার পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই" (বুখারী কিতাবুস্ সাওম, ২৫৫ পৃষ্ঠা)।

রোযার উদ্দেশ্য

রোযা আত্মশুদ্ধির মাধ্যম। যেখানে মানুষ খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে কামনা-বাসনাকে পরিহার করে দেয় সেখানে তার আত্মাকে অধিক থেকে অধিক পুণ্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সব রকমের হারাম ও অপবিত্র জিনিষ থেকে রক্ষা করার শিক্ষাও এর মধ্যে পাওয়া যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন ঃ কাউকে অভুক্ত ও পিপাসার্ত রেখে মারা রোযার উদ্দেশ্য নয়। যদি অভুক্ত থেকে বেহেশ্ত লাভ হতো তাহলে আমি মনে করি ঘোরতর কাফির ও মুনাফিকও এটা লাভের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতো। কেননা, অভুক্ত ও পিপাসার্ত থেকে মারা যাওয়া কোন কঠিন কাজ নয়" (আল্ ফযল ৩০-৩-১৯২৬)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল বলেন, "যে লোক রোযায় খোদার জন্যে নিজের হালাল জিনিষকে পরিত্যাগ করে যেগুলো ভোগ করা তার জন্যে কোন আইনতঃ ও চারিত্রিক অপরাধ নয় তাই এতে তার এ অভ্যেস গড়ে ওঠে যে, অন্যের জিনিষ অবৈধ পন্থায় ভোগ করে না এবং ওগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না। সে যখন খোদার জন্যে হালাল দ্রব্যকে পরিত্যাগ করে তখন তার দৃষ্টি হারাম দ্রব্যের প্রতি যেতেই পারে না" (আল ফযল, ১৮-১২-১৯৪৪)।

রোযাদারের মর্যাদা

হাদীসে কুদসীতে এসেছে। **কুল্লু আমালিবনি আদামালাহু ইল্লাস্সিয়ামু ফা ইন্নাহু লী ওয়া আনা আজযী বিহী ওয়াস্ সিয়ামু জুন্নাতুন** । অর্থাৎ মানুষের সব কর্ম তার নিজের জন্যে কিন্তু রোযা আমার জন্যে। এজন্যে আমি স্বয়ং এর প্রতিদান হবো, রোযা ঢালস্বরূপ (বুখারী কিতাবুস্ সাওম পৃষ্ঠা ঃ ২৫৫)। কেননা সে তার সব কামনা বাসনা এবং খাবার ও পানীয় আমার খাতিরে পরিহার করেছে।

আবার **ওয়াল্লাযী নাফসু মুহাম্মাদীন বিইয়াদিহী লা খুলূফু ফামিস্ সাইমু আত্বইয়াবু 'ইনদাল্লাহি মিন রীহিল মিসকি** অর্থাৎ ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রাণ, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্তাআলার নিকট কস্তুরীর চেয়েও অধিক পবিত্র ও সুগন্ধি (বুখারী কিতাবুস্ সওম, পৃষ্ঠা ঃ ২৫৫)।

রোযার প্রকার ভেদ

কুরআন ও হাদীসে অনেক প্রকার রোযার কথা পাওয়া যায়। যেমন, ফরয রোযা ও নফল রোযা। ফরয রোযার উদাহরণ যেমন ঃ (১) রমযানের রোযা, (২) রমযানের কাযা রোযা, (৩) যিহারের কাফফারার রোযা, (৪) হত্যার কাফ্ফারার রোযা, (৫) স্বেচ্ছায় রমযানের রোযা ভঙ্গ করণে তার শাস্তিস্বরূপ ৬০টি রোযা, (৬) কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার রোযা, (৭) মানতের রোযা, (৮) তামাত্তু বা কিরান হজ্জের রোযা, (৯) ইহরাম থাকা অবস্থায় শিকার করলে রোযা এবং (১০) ইহরাম অবস্থায় মাথা মুড়িয়ে ফেলার রোযা।

নফল রোযার উদাহরণ যেমন ঃ (১) শওয়ালের ৬টি রোযা, (২) আশুরার রোযা, (৩) দাউদ (আঃ)-এর রোযা অর্থাৎ একদিন রোযা ও একদিন রোযা না রাখা, (৪) আরাফাতের দিন রোযা, (৫) প্রত্যেক ইসলামী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা।

রোযার নিষিদ্ধ দিন ঃ

(১) কেবল শনি ও জুমুআর দিন-বিশেষ রোযা রাখা, (২) ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা, (৩) দু'ঈদের দিন ও আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহাজ্জ রোযা রাখা নিষেধ।

রোযা কার ওপরে ফরয ?

রমযানের রোযা প্রত্যেক বালেগ, বুদ্ধিমান, সুস্থ, বাড়ীতে অবস্থাকারী মুসলমান নর ও নারীর ওপরে ফরয। মুসাফির ও রুগ্ন ব্যক্তিদেরকে এথেকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। তারা অন্যদিনে এসব রোযা পূর্ণ করবে। চির রোগা, যাদের কখনও সুস্থ হওয়ার আশা নেই বা এমন দুর্বল ও বৃদ্ধ যাদের পরবর্তীতে রোযা রাখার শক্তি নেই আর এভাবে এমন দুগ্ধবতী নারী ও গর্ভবতী নারী যারা ধারাবাহিকতার সাথে রোগাক্রান্ত থাকে এমন অক্ষম ব্যক্তিদের সাধ্যানুযায়ী 'ফিদিয়া' আদায় বিধেয়।

রোযা কখন রাখা উচিত ঃ

রমযানের রোযা রাাখার জন্যে আদেশ এই যে, **লা তাসূমু হাত্তা তারাবুল হিলালা**-অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রমযানের চাঁদ দেখা না যায় রোযা রাখবে না। এ চাঁদ দেখা স্বচক্ষে দেখাও হতে পারে বা চাঁদ দেখার কথা জানাও হতে পারে।

চাঁদ দেখার কথা দু'ভাবে জানা যেতে পারে ঃ (১) শা'বান মাসের ৩০ দিন পুরো হবার পরে, (২) উম্মতের আলেমরা সর্বসম্মতভাবে একটা ক্যালেন্ডার তৈরী করতে পারে যাতে চাঁদ উঠার পুরো হিসাব থাকে এবং ভুলের কোন সুযোগ না থাকে।

রেডিও প্রভৃতির মাধ্যমে চাঁদ দেখার খবর শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য। এতদনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মান্য করা আবশ্যক। কিন্তু যেখানে চাঁদ দেখা গেছে আর যেখানে খবর পৌঁছেছে উভয় স্থানের দিগন্ত ও সূর্যোদয়ের স্থান একই হওয়া জরুরী। অর্থাৎ যদি দু'টো অঞ্চলের ব্যবধান অনেক বেশি হয় যেমন বৃটেন ও বাংলাদেশ তাহলে এক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

যদি আকাশ পরিষ্কার না হয় আকাশে মেঘ বা কুয়াশা থাকে তাহলে চাঁদ দেখার প্রমাণ হিসেবে একজন নির্ভরযোগ্য ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু ইফতার ও ঈদুল ফিতর উদযাপনের সিদ্ধান্তের জন্য কমপক্ষে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষ্য জরুরী (তিরমিযী, কিতাবুস্ সওম)।

রোযা রাখার জন্যে নিয়্যত জরুরী ঃ

যে ব্যক্তি রোযা রাখার ইচ্ছা করেন তার জন্য রোযা রাখার নিয়্যত করা জরুরী। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

মাল্লাম ইয়াজমা'ইস্ সওমা ক্বলাল ফাজরি ফালা সিয়ামালাহূ - অর্থাৎ যে সুব্হে সাদিকের পূর্বে রোযার নিয়্যত না করে তার কোন রোযা নেই (তিরমিযী, কিতাবুস্ সওম)। নিয়্যতের জন্যে কোন নির্ধারিত বাক্য মুখ দিয়ে বলার দরকার নেই। নিয়্যত আসলে মনের ইচ্ছা ও সংকল্পের নাম যে, সে কোন কারণে পানাহার পরিত্যাগ করেছে।

নফল রোযার জন্যে দুপুরের আগে নিয়্যত করলে চলে তবে শর্ত এই যে, নিয়্যত করার আগ পর্যন্ত কিছু খায় নি। এভাবে যদি কোন কারণে যেমন, চাঁদ দেখার সংবাদ সূর্য ওঠার পরে পাওয়া গেছে অথচ তখনও কিছু খাওয়া হয় নি এমতাবস্থায় রোযার নিয়্যত করা যেতে পারে এবং এমন ব্যক্তির সেদিনের রোযা হয়ে যাবে।

সেহরী খাওয়া প্রসঙ্গে ঃ

হুযূর (সঃ) বলেছেন ঃ

'তাসাহ্হারু ফা ইন্না ফীস্সাহূরি বারাকাতিন' অর্থাৎ সেহরী খাও কেননা সেহরী খাওয়ার মধ্যে কল্যাণ আছে।

বর্তমানকালে সুব্হে সাদিকের পূর্বে ঘড়ির মাধ্যমে অনুমান করে এভাবে সময় নির্ধারণ করা যায় যে, কোন দিন সূর্য ওঠার সময় নোট করে নেয়া যায় আর এর প্রায় ১ ঘন্টা ২০ মিঃ পূর্ব পর্যন্ত সেহরী খাওয়া যায়।

হাদীসে এসেছে ঃ **তাসাহ্হার ফাসুম্মা কুমনা ইলাস্সলাহ্** অর্থাৎ সেহরী খাওয়ার পরে আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে যেতাম (তিরমিযী, কিতাবুস সওম)।

সেহরী খাওয়া এবং নামায ফজরের মধ্যে ৫০টি কুরআনী আয়াত তেলাওয়াত করা যায় এতটা পার্থক্য থাকা আবশ্যক।

ইফতার করার সময় ঃ

হাদীসে এসেছে ঃ

ইযা আক্বালাল্লায়লু ওয়া আদবারান্নাহারু ওয়া গাবাতিশ্ শামসু ফাক্বত্বাদ আফতারাস্ সাইমু অর্থাৎ দিন চলে যায় রাত আসে সূর্য ডুবে যায় তখন ইফতার কর (তিরমিযী, পৃষ্ঠা ৮৮)।

সূর্য অস্ত যাওয়ার ১/২ মিনিটের মধ্যে ইফতার করে নেয়া উচিত। দেরী করা ঠিক নয়। হুযূর (সঃ) বলেছেন ঃ

লা ইয়াযালুন্নাসু বিখয়রিম্মা 'আজ্জালূল ফিতরা অর্থাৎ রোযা ইফতার করতে যতক্ষণ লোকেরা সময়নিষ্ঠ হবে ততক্ষণ তারা কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করতে থাকবে (বুখারী, ১ম খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

কি দিয়ে ইফতার করবে ঃ

খেজুর, দুধ, পানি দিয়ে রোযা ইফতার করা বা খোলা রীতি সম্মত।

ইফতারের সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত ঃ

আল্লাহুম্মা ইন্নী লাকা সুমতু ওয়া 'আলা রিয্ক্বিকা আফতারতু অর্থাৎ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার উদ্দেশ্যেই রোযা রেখেছি। আর তোমার দেয়া রিয্ক দিয়েই ইফতার করেছি (আবূ দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২২)।

ইফতারের পরে পাঠ করুন ঃ

যাহাবায্ যাম্য়া ওয়াবতাল্লাতিল 'উরূকু ওয়া সাবাতিল আজরু, ইনশাআল্লাহু অর্থাৎ পিপাসা দূর হয়ে গেছে আর শিরা-উপশিরা তাজা ও সজীব হয়ে গেছে এবং পুরস্কার নির্ধারিত হয়ে গেছে, যদি আল্লাহ্ চান (আবূ দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২১)।

রোযাদারকে ইফতার করানো পুণ্যের কাজ ঃ

মান ফাত্তারা সাইমান কানা লাহূ মিসলু আজরিহী গয়রা আন্নাহূ লা ইয়ান কুসু মিন আজরিস্ সাইমি শায়উন - অর্থাৎ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে রোযাদারকে ইফতার করায় তার রোযা রাখার সমান পুণ্য লাভ হবে এতে রোযাদারের পুণ্যে কোন কমতি হবে না (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১০০)।

রোযা ভঙ্গের কারণ ঃ

স্বেচ্ছায় খেলে, পান করলে এবং যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। জোলাপ নিলে, ইনজেকশন দিলে এবং জেনে বুঝে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়।

স্বেচ্ছায় রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেললে সে রোযার কাযা করা ছাড়াও কাফ্ফারা (অর্থাৎ শাস্তি হিসেবে)-স্বরূপ লাগাতার ৬০টি রোযা রাখা বিধেয়। রোযা রাখার সামর্থ্য না থাকলে নিজের সাধ্যমত ৬০ জন্য অভাবীকে খাওয়াতে হবে বা একজন দরিদ্রকে ৬০ দিন খাওয়াতে হবে বা খাওয়ার খরচ দিতে হবে। যদি সে সামর্থ্যও না থাকে তবে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করতে হবে (বুখারী, ১ম খন্ড, ২৫৯)।

যদি কেউ ভুলে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে পাপ হবে না। কিন্তু ঐ রোযা কাযা করতে হবে। যদি রোযা রাখা অবস্থায় মেয়েদের 'বিশেষ কাল' আরম্ভ হয়ে যায় বা সন্তান জন্ম নেয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে তবে সে রোযা পরবর্তীতে পুনরায় রাখতে হবে।

যেসব কাজে রোযা ভঙ্গ হয় না ঃ

যদি ভুলে কেউ পানাহার করে ফেলে তা হলে তার রোযা ভঙ্গ হবে না বা তার রোযায় কোন প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি হবে না (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা)

যদি অনিচ্ছায় কারও গলায় বা পেটে ধূয়া, ধূলো-বালি, মাছি, কুলি করার সময় সামান্য পানি ঢুকে যায় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। এভাবে কানে পানি গেলে বা ঔষধ প্রয়োগ করলে, সর্দি বের হলে, অনিচ্ছায় বমি এলে, চোখে ঔষধ দিলে, নাক দিয়ে রক্ত পড়লে, দাঁত থেকে রক্ত বের হলে, বসন্তের টিকা নিলে, মিসওয়াক বা ব্রাশ করলেও সুগন্ধির ঘ্রাণ নিলে, নাকে ঔষধ দিলে (বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯), মাথায় বা দাড়ীতে তেল লাগালে, শিশু বা সহধর্মিণীকে চুমু খেলে, দিনের বেলা স্বপ্নদোষ হলে (তিরমিযী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯২), বা সেহরীর সময় ফরয গোসল না করতে পারলে রোযা ভঙ্গ হয় না। দিনের বেলা মেয়েরা সুরমা লাগাতে পারে কিন্তু পুরুষের বেলায় হযরত রসূলে করীম (সঃ) ও হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) রাতে সুরমা লাগাতে বলেছেন। (চলবে)

(সূত্র - ফিকাহ্ আহমদীয়া)

- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বিবাহ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

প্রথম কিস্তিতে আমরা বিবাহ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা করেছি। এখন আরো কিছু আলোচনা করছি।

বিবাহের ফলে পরিবার গঠিত হয়েছে। আর এসব পরিবার নিয়ে হয়েছে সমাজ। সমাজবদ্ধ মানুষ একটা শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপন করে। শান্তিতে বসবাস করে। সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে কালাতিপাত করে। এই বন্ধন না হলে মানুষ হ'ত পশুর মত। তাদের জীবন হত যথেচ্ছাচারী। কে কার পিতা বা সন্তান তার কোন ঠিক ঠিকানা থাকত না। মারামারি কাটাকাটি করে মানুষ ধ্বংস হয়ে যেত। নারীর দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকত না। এইডস্ প্রভৃতি ব্যাধিতে সমগ্র মানব সমাজ লয়প্রাপ্ত হত। তাই বিবাহ হল স্রষ্টার আশীর্বাদ। বিশ্বমানবতার জীবন। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা এ বিবাহ সূত্রে গ্রথিত। আমরা পূর্বেই বলেছি নারী ও নরের দেহ একে অপরের পরিপূরক। লক্ষ্য করলে মহান স্রষ্টার পরিকল্পিত এই সৃষ্টি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। শিশুকালে নারী শিশু ও নর শিশুর লিঙ্গ ভেদ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন যৌন কামনা থাকে না। উপযুক্ত বয়সে এ কামভাব জাগরিত হয়। আর তা বৈধভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে মিটাবার জন্য দুই বিপরীত লিঙ্গের মিলন যার বৈধ নাম বিবাহ ব্যবস্থা।

ইসলাম বিবাহের ব্যাপারে বাধা নিষেধ সহ নিয়ম নীতি চালু করেছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে বিবাহের সংখ্যা কাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ বা অবৈধ এসব বিষয়ে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। শিশু কন্যাকেও বিয়ে করা হত। এদেরকে বলা হত নগ্নিকা অর্থাৎ যারা নগ্ন থাকে। বালায় বসিয়ে সাত পাক দেয়া হত। আজ কাল হিন্দু ধর্মে মামাত, চাচাত ভাই বোনে বিয়ে নিষেধ। স্ত্রীরা ছিল স্বাধীন। সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও পাপ ছিল না। (মহাভারত, আদি পর্ব দ্রষ্টব্য)।

স্ত্রীদেরকে বয়স অনুপাতে বলা হত নগ্নিকা, গৌরী, রোহিনী, কন্যা, রজস্বলা ইত্যাদি। ইহুদী শাস্ত্রে দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদনের বিধান আছে (দ্বিতীয় বিবরণ, ২৫ অধ্যায়)। তখন জরায়ুর স্বাধীনতা (?) ছিল। Dr. John Robinson লিখিত (প্রাক্তন বিশপ উলউইক কর্তৃক সমর্থিত) পুস্তকে লিখেছেন, A truely christian married couple should not hesitate to take into their home a lonely women, even if it is an additional sexual partner for the husband (The people London, Sunday 29th December, 1969)। রাশিয়ার চিত্র আরো ভয়াবহ। প্রবোধ কুমার সান্যাল লিখেছেন, "একজন স্ত্রী এসে যদি তার স্বামীকে ডেকে হঠাৎ বলে, দেখ, আমার এই দ্বিতীয় সন্তানটি তোমার নয়, অমুকের, তাহলে স্বামী ছুটে গিয়ে ছুরি কাটারী খোঁজে না (রাশিয়ার ডায়রী, ২৬০, ২৮৩ পৃঃ)।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয় জনের মধ্যে একজন হ'ল কুমারী মাতা (রিডার্স ডাইজেস্ট, আগষ্ট ১৯৬৩)। জানা মতে প্রায় তিন লক্ষ অবৈধ সন্তান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করে।

ইসলাম জিনার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছে। বিবাহ বাধ্যতামূলক না হলে ব্যভিচারকে রোধ করা যাবে না। প্রয়োজনে এজন্য একাধিক বিবাহের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। ব্যভিচার এবং অবৈধ সন্তান থেকে রক্ষা পেতে হলে এছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই। স্বীকার করা হয়েছে- A return to polygamy the natural relationship between the sexes, would remedy many evils : Prostitution, veneral diseases, abortion, the misery of illigimate children, the misfortune of Millions of unarried women (The future of Marriage in western civilization)।

হিন্দু ধর্মে ও খ্রীষ্টানধর্মে তালাকের কোন বিধান ছিল না। ইদানিং আইন করে বিবাহ-বিচ্ছেদকে চালু করা হয়েছে। ইসলাম বলে, সকল বৈধ কাজের মধ্যে তালাক নিকৃষ্ট। তবে বাধ্য হয়ে যেমন দেহের অঙ্গ অপারেশন করে ফেলে দিতে হয় তেমনি বাধ্য হলে বিবাহেও 'সেপারেশন' করতে হয়।

হিন্দু ধর্মে সতীদাহের প্রচলন ছিল। স্বামীর মৃত্যু হলে তার স্ত্রীদেরকেও জীবন্ত দাহ করা হত। যে স্ত্রী মরতে অস্বীকার করত সে অসতী বলে গণ্য হত। ৪/১২/১৮২৯ সালে ইংরাজ সরকার এ জঘন্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করেন। ইংরেজ এসেছিল হিন্দু বিধবাদের আশীষরূপে। ইংরেজ হ'ল হিন্দু ধর্মের মোজাদ্দেদতুল্য।

হিলা বিবাহের ফতোয়া

ফতওয়া শব্দটি 'ফাতা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ, - যৌবন, নতুনত্ব, সরলীকরণ ও ব্যাখ্যা। মুফতীরা যে ফতওয়া প্রদান করে থাকেন তার অর্থ হল, ব্যাখ্যা প্রদান। প্রসিদ্ধ অভিধান কামুসে বলা হয়েছে, - মা আফতি বিহি আল ফকিহু। অর্থাৎ ফকিহগণ যা প্রকাশ করেন তা-ই ফাতওয়া। ফকীহ কে? ফিক্হ শব্দ থেকে ফিকাহ। এর অর্থ, বুঝ, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মনীষা, ধর্মীয় জ্ঞান, ধর্মীয় আইন অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী মনীষীরা ধর্মীয় ব্যাপারে বা আইন সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তা-ই ফতওয়া। এ থেকে বুঝা যায়, প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী মনীষী ব্যক্তি ছাড়া যদু, মধু, রহীম, করীম **ফতওয়া দিতে পারে না**। পবিত্র কুরআনে ফতওয়া শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। যেমন, নবী সুলায়মান (আঃ) সাবার রাণী বিলকিসের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর সভা পন্ডিতদের কাছে মতামত জানতে চান। কুরআনে বলা হয়েছে,- **আফতুনী ফি আমরী**। অর্থাৎ- আপনারা আমাকে এ পত্র সম্বন্ধে মতামত দিন। **আফতুনী** অর্থাৎ ফতওয়া দিন। এখানে ফতওয়ার অর্থ, মতামত, ব্যাখ্যা, পরামর্শ ইত্যাদি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খলীফা একটি পরিষদ গঠন করতেন। এ পরিষদের নাম, দারুল ইফতা। কতিপয় জ্ঞানী, গুণী এবং প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিরা এর সদস্য পদে

মনোনীত হতেন। এ সব পন্ডিত জনের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান মনোনীত করা হত। তাঁকে বলা হত মুফতী। ফতওয়া ব্যাখ্যা বা অভিমত দেবার অধিকারী ছিলেন এই মুফতী। অন্য কেউ ফতওয়া বা ফয়সালা দেবার ক্ষমতা রাখত না। এমনকি খলীফা নিজেও ফতোয়া দিতেন না। তিনি শাস্ত্রীয় সকল বিষয়ে অভিমত প্রদানের জন্য মুফতীর কাছে প্রেরণ করতেন। মুফতীর মতামতকে কেউ অস্বীকার করতে পারত না। মুফতী ছাড়া অন্য কেউ মহাপন্ডিত ব্যক্তি হলেও ফতওয়া দিতে পারত না। অর্থাৎ তখন স্বঘোষিত কোন মুফতী ছিল না। অবৈধ মুফতীদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত।

আজকাল গ্রামের অল্প শিক্ষিত মোল্লা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মৌলবীরা পর্যন্ত ফতওয়া দিয়ে থাকেন। তাদের কেউ কেউ নামের আগে মুফতী লকবটিও ব্যবহার করে থাকেন। এসব স্বঘোষিত মুফতীদের একের ফতওয়া অপরের ফতওয়ার সঙ্গে মিলে না। ইখতেলাফ হয় নানা বিষয়ে। সুন্নীদের ফতোয়া শীয়ারা মানে না। এমনি এক মজহাবের লোক অন্য মজহাবের ফতওয়া গ্রাহ্য করে না। নামায পড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধেও নানা দলে মত পার্থক্য রয়েছে। হানাফীরা বলেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে নামায হবে না। অন্য মজহাবের মুফতীরা বলেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না। কে বলবে এর কোন্‌টি সত্য? এ জন্যই ইসলামে খলীফার প্রয়োজন। 'খলীফা' মুফতী নিয়োগ করে এর ফয়সালা দিবেন। খলীফা ছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে একত্র করা এবং একমত ও এক পথে কায়েম রাখার আর কেউ নেই। খলীফা না থাকলে যে যার ইচ্ছা মত ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিবে এবং স্ব স্ব পথে চলবে। খলীফা একতার প্রতীক। খলীফা ছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীয়া ছিন্ন ভিন্ন, শতধা বিভক্ত। বিশ্বের মুসলমানরা একজন আমীরুল মু'মিনীনের অধীনে না থাকায় ইসলামে আজ তিহাত্তর ফিরকা। মুসলমানরা আজ একমত ও এক পথের অনুসারী নয়। নানা মত ও পথের মুসলমান কোন কোন সময় পার্থক্য নিয়েও এক জোট নয় বটে তবে এক হয় না। ঐক্য জোট অর্থই নানা মতের মুসলমানের সাময়িক জোট বা রাজনৈতিক জোট। আজ উম্মতে মুহাম্মদীয়া নেতা বিহীন। তারা সবাই রাজা, কেউ কারো অধীন নয়। তাই যে যার খুশীমত ফতওয়া দিয়ে যাচ্ছে। এমনসব ফতওয়াও আছে যা কুরআন সমর্থন করে না। এসবের মধ্যে হিলা বিবাহ একটি।

ইসলামে বিবাহ বাধ্যতামূলক। তবে অসুস্থতা বা সঙ্গত কারণে যদি কেউ বিয়ে করতে না পারে তাহলে তাতে কোন পাপ নেই। ইসলাম তালাককে নিকৃষ্ট জ্ঞান করে (আবূ দাউদ, ইবনে মাজা)। তবে বাধ্য হয়ে যদি তালাক দিতেই হয় তাহলে উভয় পক্ষের সালিসির পর ভেবে চিন্তে ভদ্রভাবে তালাক দিবে। স্ত্রীর প্রাপ্য যথাযথ আদায় করে দিবে। একসঙ্গে তিন তালাক বিদাত। প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর স্বামী স্ত্রী ইচ্ছা করলে মিলিত হতে পারে। এ মিলনের ফলে দেয় তালাক বাতিল হয়ে যায়। চূড়ান্ত তালাকের পরও স্বামী-স্ত্রী ইচ্ছা করলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তবে এহেন তালাক মাত্র দু'বার দেয়া যায়। **আত্ তালাকু মার্রাতাইন**। তিন তুহুরে (পবিত্র অবস্থায়) তিন তালাক দিতে হয়। একসঙ্গে হাজার বার তালাক উচ্চারণ করলেও তা এক তালাক হিসাবে গণ্য। চূড়ান্ত তালাক হয়ে গেলে (তৃতীয় বার) স্বামী-স্ত্রী আর মিলিত হতে পারবে না। একে অপরকে বিবাহও করতে পারবে না। যতক্ষণ ঐ স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয় এবং বিবাহের পর নুতন স্বামীর মৃত্যু হলে বা পুনরায় তালাক হয়ে গেলে পূর্ববর্তী স্বামী ঐ স্ত্রীকে আবার বিয়ে করতে পারে। এখান থেকেই হিলা বিবাহের উৎপত্তি।

উত্তেজনার বশে বা অন্য কোন কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীকে তিনবার তালাক উচ্চারণ করে পরিত্যাগ করে তাহলে মোল্লাদের মতে তা তালাকে বায়েন হয়ে যায়। অথচ কুরআনের মতে তা তালাক হয় না। এ তালাকের পর স্বামীর রাগ কমলে, মাথা ঠান্ডা হলে, বাচ্চাদের কান্নাকাটির ফলে যখন আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় তখন মোল্লারা একটি কৌশল বাতলিয়ে দেন। এ কৌশল বা অপকৌশলকে আরবীতে 'হিলা' বলে। এক রাতের জন্য কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে এ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে দেয়া হয়। ওরা এক রাত একত্রে বাস করে। সহবাস করা বাধ্যতামূলক বলে ফতওয়া দেয়া হয়। পর দিন ঐ এক রাতের স্বামী (?) তালাক দেয় (একসঙ্গে তিনবার)। অতঃপর মেয়াদ বা ইদ্দত অতিক্রান্ত হলে পূর্ববর্তী স্বামী ফিরে পায় তার হারান ধনকে। এহেন বিবাহ ইসলাম সমর্থন করেন না। এটি একটি বেহাপনা। এর তুলনা একমাত্র মোতা বা সাময়িক বা অল্প স্থায়ী বিবাহ এবং আর্য সমাজীদের নিয়োগ প্রথার সঙ্গেই হতে পারে। নিয়োগ হল, স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য কোন পুরুষকে নিয়োগ করা। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম পুরুষ এভাবে নিয়োগের মাধ্যমে সন্তানের পিতা হয়ে থাকে। এ সন্তানকে বলা হয় 'ক্ষেত্রজ' সন্তান। এ ব্যাপারে স্বামী দয়ানন্দের 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

একটি হিলা কাহিনী

অচিন্তপুরের ফজর আলীর মেয়ে সখিনা। দেখতে সুন্দর তাই বিয়ের বহু প্রস্তাব এসেছে ফজর আলীর কাছে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে গেল গ্রামের তরফদার বাড়ীর যুবক রুকনের সঙ্গে। খুব সুখী তারা। রুকন আর সখিনার সংসারটি অনেকের কাছেই একটি কাম্য সংসার।

দেশে রূপবানের পালা এসেছে। বানের ঢলের মত মানুষ যাচ্ছে এ যাত্রা দেখতে। এই না দেখে গাঁয়ের মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদের অঙ্গনে একটি বৈঠক ডাকলেন। ওয়াজ করে বল্লেন, কেউ এ নাজায়েয যাত্রা দেখতে যাবে না। যদি কেউ যায় তাহলে তার বৌ তালাক হয়ে যাবে। তিনি ওয়াদা নিলেন। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাই হাত উঠাল।

একদিন রুকন পাশের গ্রামের তার বন্ধু সলিমকে খুঁজতে গিয়ে জানল যে, সলিম যাত্রা দেখতে গিয়েছে। কাজটা ছিল জরুরী। রুকন ভাবল, যাত্রার কাছে গিয়ে কাউকে দিয়ে সলিমকে ডেকে আনবে, সে

যাত্রার বেষ্টনীর মধ্যে যাবে না। সেই মতে রুকন যাত্রার কাছে গিয়ে বেড়ার বাইরে থেকে সলিমকে উচ্চস্বরে ডাকল। কয়েক ডাকের পর সলিম বেরিয়ে এল। তখনও যাত্রা শুরু হয় নি। সলিম বলল, আয় ভিতরে বসি। রুকন বলল, না আমি ভিতরে যাব না। নিষেধ আছে। সলিম বলল, 'যাত্রা তো শুরু হয় নি, একটুখানি এসে বস। যাত্রা শুরু হলে চলে যাবে'। রুকন গিয়ে বসল যাত্রার আসরে। এ খবর চলে গেল বিদ্যুতের মত। ইমাম সাহেব রুকনকে ডেকে বললেন, তুমি যাত্রা দেখেছ, তোমার বউ তালাক হয়ে গেছে। আজ থেকে এই বৌ তোমার জন্য হারাম। রুকন কসম করে বলল, সে যাত্রা দেখে নি, ওখানে অল্পক্ষণ বসেছিল মাত্র। কিন্তু ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করলেন না। সখিনার পিতাকে ডেকে এনে বললেন, 'মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে যাও। তালাক হয়ে গেছে। সে আর রুকনের স্ত্রী নয়'। ফজর আলীর মাথায় যেন বাজ পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে কথাটি সমস্ত গ্রামে প্রচার হয়ে গেল। সবাই বলল, হায়, হায়, একি সর্বনাশ হল! সখিনার কপাল ভেঙ্গে গেল? ক্রন্দনের রোল উঠল ফজর আলীর বাড়ীতে। রুকন পাগলের মত এখানে সেখানে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু কোন আশ্রয় বা সান্ত্বনা পাচ্ছে না। সখিনা বেহুস হয়ে গেল। ধরাধরি করে তাকে বাপের বাড়ী নিয়ে গেছে আত্মীয়-স্বজনরা। রুকন ইমাম সাহেবের পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। বলল, একটা ব্যবস্থা করে দিতে। ইমাম সাহেব বললেন, ব্যবস্থা একটাই। সখিনার বিয়ে হবে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে। তারপর ঐ স্বামী তালাক দিলে ইদ্দতের পর রুকনের সঙ্গে পুনরায় বিয়ে হতে পারে। রুকন চিন্তায় পড়ল। কার কাছে বিয়ে দেবে তার বউকে? বিয়ে দিলে সখিনাকে তালাক দিবে কি? সখিনা সুন্দরী, তাই বিয়ে করে কেউ তালাক দিবে বলে বিশ্বাস হয় না। দেখতে দেখতে চার মাস চলে গেল। রুকন দূর থেকে সখিনাকে দেখে, সমাজের ভয়ে কাছে যায় না।

একদিন ইমাম সাহেব রুকনকে ডেকে বললেন, 'দেখ রুকন, আমি তোমার কষ্ট দেখে বলছি। আমি বয়স্ক মানুষ। দেশের বাড়ীতে আল্লাহ্‌র ফযলে আমার তিন বউ আছে। বাচ্চা কাচ্চাও আছে, মাশাআল্লাহ্। আমার বিয়ের কোন প্রয়োজন নেই। তবে তোমার কষ্ট লাঘবের জন্য আমি সখিনাকে বিয়ে করতে পারি। অবশ্য তালাক দিয়ে দেব, যাতে তুমি আবার বিয়ে করতে পার।' রুকন আর কোন পথ না দেখে এতে রাজি হয়ে গেল।

ইমাম সাহেবের সঙ্গে সখিনার বিয়ে হয়ে গেল নীরবে। ইশার নামাযের পর ইমাম সাহেব চোখে সুরমা দিয়ে আতর লাগিয়ে ফজর আলীর বাড়ীতে গেলেন রাত্রি যাপনের জন্য। সখিনাকে আর ইমাম সাহেবকে একঘরে দেয়া হল। সখিনা ইমাম সাহেবের কদম বুসি করল আর অনবরত চোখের পানি মুছতে লাগল। ইমাম সাহেব বললেন, 'কাদছ কেন সখিনা! আজতো আনন্দের দিন। তুমিতো রুকনকে পাবে, তবে একরাত মাত্র আমার সঙ্গে কাটাতে হবে।' সখিনা বলল, 'হুযূর আপনি আমার বাবার মত।' বাঁধা দিয়ে ইমাম সাহেব বললেন, 'তৌবা, তৌবা! একি কথা বলছ! আমি তোমার স্বামী। 'আস্তাগফার' পড় সখিনা, নইলে ভয়ানক গুণা হবে।' সখিনা তৌবা করল কিনা বোঝা গেল না। সে ঘরের এক কোণে চুপ চাপ বসে রইল। 'ইমাম সাহেব ডাকলেন, 'সখিনা কাছে এসে বস।' সখিনা আসল না। ইমাম সাহেব উঠে ধরে সখিনাকে পাশে এনে বসালেন, আদর করলেন। কিন্তু সখিনা ইমাম সাহেবের সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমাতে রাজি হল না। ইমাম সাহেব বহু বুঝালেন কিন্তু সখিনা অনড়, অটল। এমনিভাবে সারা রাত চেষ্টা করেও সখিনাকে স্ত্রী ধর্ম পালনে রাজি করাতে পারলেন না ইমাম মুকশেদ আলী কারী সাহেব।

ফজরের আযানের পর ইমাম সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে চলে গেলেন। রুকন সারা রাত ঘুমায় নি, সখিনাদের বাড়ীর আশে পাশে পায়চারি করে কাটিয়েছে সে। ফজরের নামাযের পর রুকন সখিনার বাপকে নিয়ে ইমাম সাহেবের কাছে গেল তালাক নেবার জন্য। ইমাম সাহেব বললেন, সহবাস হয় নি তাই তালাক হবে না। সহবাস হল বিয়ের অবিচ্ছেদ্য বিষয়। আরবীতে একে বলে নিকাহ! ফজর আলী এবং রুকন মহা ফেসাদে পড়ে গেল। দৌড়ে গেল পাশের গ্রামের ইমাম সাহেবের কাছে। এ ইমাম একজন বড় আলেম। ফতওয়া জানতে চাইল তারা। ঐ ইমাম সাহেব বললেন, সহবাস জরুরী। সহবাস ছাড়া বিয়ে অসম্পূর্ণ। ফিরে এল শ্বশুর জামাই নিরাশ হয়ে। বাড়ীতে এসে সখিনাকে বুঝাল বিষয়টি। সখিনা রাজি হয় না। সবাই বলল, 'রাজি হয়ে যা, নইলে তালাক হবে না, রুকনকে ফিরে পাবে না।' অগত্যা সখিনা রাজি হল। ইমাম সাহেব সখিনাকে নিয়ে রাত্রি যাপন করলেন। ফজরের আগে গোসল করে ইমাম সাহেব নামায পড়ালেন। এরপর ফজর আলী আর রুকন গেল তালাক আনতে। ইমাম সাহেব বললেন, "তিন মাস দশ দিন দেখে তালাক দেব। কারণ সখিনার পেটে যদি আমার বাচ্চা এসে থাকে তাহলে আমি আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তালাক দিতে পারি না।"

রুকন লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে বলল, 'বেঈমান!" ফজর আলী তাকে থামিয়ে বলল, 'মাথা গরম কর না, দেখা যাক কি হয়' 'এমন করে রাত আসে রাত যায়। সখিনার খাওয়া-দাওয়া নেই, শুধু কাঁদে আর কাঁদে। ইমাম সাহেবকে তার বিষের মত লাগে। কিন্তু উপায় নেই। এভাবে কেটে যায় সাত দিন।

একদিন সকালে উঠে দেখা গেল সখিনা ঘরে নেই। তালাশ করে তাকে কোথাও পাওয়া গেল না। দুপুর বেলা বাড়ীর পিছনের বট গাছটায় সখিনার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়া হল। দারোগা এসে লাশের সুরত হাল করলেন। ডায়রিতে লিখলেন, সখিনা জওজে কারী মুকশেদ আলী! মরণের পরও রুকন আর স্বামীর স্বীকৃতি পেল না।

(এ রচনায় নামগুলো কাল্পনিক, তবে ঘটনাটি সত্য ঘটনার একটি)।

- আহমদ তৌফিক চৌধুরী

বিয়ের প্রাসঙ্গিক কথা

মানুষের জীবন কালকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। (১) শৈশব কাল (২) যৌবন কাল এবং (৩) বৃদ্ধকাল। এ তিন কালের মধ্যে যৌবন কালটাই হলো মারাত্মক। শৈশব ও বৃদ্ধকাল নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে যায় কিন্তু যৌবনকাল বড় অস্থির, অশান্ত। যৌবন কাল নদীর স্রোতের বেগে দু'কুল ভাসিয়ে নিয়ে ছুটে চলে। উত্তাল জোয়ারের টানে উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীরা দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবেগের স্রোতে ভেসে যায়। এ সময় তাদের চোখে আঁটা থাকে রঙিন কাঁচের চশমা। এ চশমার মাঝ দিয়ে তারা যা কিছুই দেখে, তা-ই তাদের কাছে রঙীন বলে মনে হয়। রঙীন নেশার টানে তারা ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে এক সময় তারা জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক সবকিছু হারিয়ে ফেলে। সে সময় তারা তাদের সামনে যা পায়, তা-ই প্রাণ ভরে উপভোগ করতে চায়। ছেলেমেয়েদের উচ্ছৃংখল পদচারণায় দেশের সমাজ সংস্কৃতির অঙ্গন আজ উদ্যম বিনোদনের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। আজ এখানে চলছে সমাজ সংস্কৃতির নামে অবাধ অসামাজিক ক্রিয়াকান্ড। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিশের মাধ্যমে প্রচারিত অশ্লীল চিত্র প্রদর্শনের মহড়া। নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশার ফলে দেশ ও জাতির যুব-সমাজ আজ পাপ পঙ্কিলতার আবর্তে নিমজ্জিত। এসব অপকর্মের আবর্ত হতে যুব সমাজের পরিত্রাণের একমাত্র রাস্তা যৌবনের সদ্ব্যবহার অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এ ছাড়া জাতির যুব-সমাজকে উদ্ধার করার দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌তাআলা নারী-পুরুষের দৈহিক আকৃতি প্রকৃতি আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের দেহ মনের আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে তাদের কর্মক্ষেত্রও আলাদা আলাদা করে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নারীর কর্মক্ষেত্র প্রধানতঃ অন্দর মহলে। সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন নারীদের মুখ্য ভূমিকা। পুরুষের কর্মক্ষেত্র ঘরের বাইরে। কঠোর শ্রমের মাধ্যমে ঘরের জন্য সঞ্চয় করা। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির ক্ষেত্রে আলাদা হয়েও তারা একে অন্যের পরিপূরক। কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও এ দু'জনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি সুখী পরিবার। এ পরিবারে এরা একজন স্বামী, আরেকজন স্ত্রী। এ দু'জনকে নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন, আর তা হলো দাম্পত্য জীবন। এ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে রয়েছে এক অনাবিল সুখ। এক পরম পরিতৃপ্তি। এ বন্ধনের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বস্ততা, নির্ভরতা, দায়িত্ববোধ, একাত্মতা আর অফুরন্ত মানসিক প্রশান্তি। এখানে অসামাজিক জীবন যাপনের জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, হতাশা বা হাহুতাশ নেই। মহান ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমায় ভাস্বর স্বামী আর স্ত্রীর দু'টি জীবন। একান্ত অজানা এক নারী তার বাবা, মা, ভাই, বোন তথা সংসারের সবাইকে ছেড়ে, অজানা এক পুরুষকে যাবজ্জীবনের সঙ্গী হিসেবে বরণ করে স্বামীর ঘরে যখন প্রবেশ করে; তখন সেই স্বামী পুরুষটির নিরানন্দ গৃহখানি এক অনাবিল আনন্দে ঝলমল করে ওঠে। স্ত্রীর সাহচর্যে এসে পুরুষের জীবনে সঞ্চারিত হয় নতুন নতুন স্বপ্ন, নতুন নতুন আশা, আর এগিয়ে চলার উদ্দীপনা। তাদের পবিত্র দাম্পত্য মিলনের পথ বেয়ে নেমে আসে নতুন বংশধর, দাম্পত্য জীবনের পবিত্র ফসল। বিবাহিত জীবনের সার্থকতা এখানেই। আল্লাহ্‌তাআলার সৃষ্টির মধ্যে অনুপম বৈচিত্রই এখানে।

কুরআন করীমের সূরাতুর রূমের ২২ আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ "আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে এটিও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

রসূল করীম (সঃ) যথার্থই বলেছেন, "যুগল প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য তুমি বিয়ের চাইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই পাবে না।" – ইবনে মাজা।

বস্তুতপক্ষে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে দু'টি যুগল প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে, যা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "যখন দেখবে কোন ব্যক্তি বিয়ে করেছে, তখন সে ধর্মের অর্ধেক পূর্ণ করেছে। অতঃপর বাকী অর্ধেকের জন্য সে আল্লাহ্‌কে ভয় করুক" (বায়হাকী)। প্রকৃতপক্ষে বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে ধর্মীয় জীবন লাভ সহজসাধ্য হয়।

আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রেরিত রসূলের এতসব মূল্যবান দিক-নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের বাবা-মায়েরা তাদের ছেলেমেয়েদের শিষ্টাচার বা ইসলামী শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। যৌবনে উপনীত হওয়ার পরপরই বাবা মায়ের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়া। তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এসব নিয়ে বাবা মায়েরা ভাবে বলে মনে হয় না। বরং জামাতের পক্ষ হতে তাদের কাছে ছেলেমেয়েদের বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হলে তারা বলেন, এখন বিয়ে দেয়া হলে ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ক্ষতি হবে। আবার পড়াশুনা শেষ হলে বলেন, ছেলেকে বিয়ে দিলে তার বউকে খাওয়াবে কে? অন্যদিকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিতে নিতে মেয়ের বয়স তিরিশ পেরিয়ে যায়। মেয়ের জন্য তখন বেশি বয়সের পাত্র পাওয়া ভার। পক্ষান্তরে বাবা-মাও তাদের ছেলেমেয়েদের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থায় এক সময় দেখা যায়, মেয়েটি কোন এক গয়ের আহমদী ছেলে বিয়ে করে বসেছে। আর মেয়ের বাবাকে জামাত ত্যাগে বাধ্য হতে হয়। আমাদের ছেলে-মেয়েদের যৌবনের ধর্ম বা আকর্ষণ সম্পর্কে বাবা-মায়েরা কিছুই বোঝে না কিংবা বুঝতে চায় না। পরিণতিতে তাদের জন্য হাহুতাশ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। বাবা মায়ের দুর্দশা এখানেই শেষ নয়, যুব-বয়সের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগে কিংবা বেকারত্বের অজুহাতে বাইরের বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে চলাফিরার স্বাধীনতা পায়। তাদের সহপাঠী বা সহকর্মীদের সঙ্গে মিলামিশার সুযোগ পায়।

এ সময়টাতে তারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে।

তাদের বসনে-ভূষণে, আচার আচরণে, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকান্ডে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী ভাব ধারা প্রকাশ পায়। তাদের চিন্তা-চেতনা হতে ইসলামী আদর্শ তিরোহিত হয়ে যায়। বাইরের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাদের সহপাঠী বা সহকর্মী বন্ধুদের ন্যায় তাদের কাছেও তখন ইসলামী আদর্শ, আচরণ পুরানো আমলের মনে হয়। ইসলামী বেশভূষা বা পরদা ব্যবস্থাকে মনে হয় মধ্যযুগীয় কুপ্রথা বা কুসংস্কার। তাই তারা এসব বর্জন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনি করে তারা এক সময় অসামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়, যেখান হতে ফিরে আসা আর অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এভাবে ছেলে-মেয়েরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তারা যে কেবল নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাই নয়, সে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের বাবা-মায়ের আত্ম মর্যাদা, বংশীয় ঐতিহ্য, প্রভাব প্রতিপত্তি- সব কিছুই। যুব সমাজের নৈতিক অধঃপতন আজ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, তা দৈনিক পত্র-পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। আজ নারী নির্যাতন, নারী পাচার, ধর্ষণ তথা অসামাজিক ক্রিয়াকান্ড এমন স্তরে গিয়ে ঠেকেছে যে, এসব অসামাজিক অপকর্ম রোধ করার জন্য সরকারকে কঠিন আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করতে হচ্ছে। পুলিশের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। বাংলাদেশের তুলনায়, সারা বিশ্বের যুব সমাজের অবস্থা আরও ভয়াবহ, আরও ধ্বংসাত্মক। এ ধ্বংস যজ্ঞের কবল হতে আমাদের যুব সমাজকে উদ্ধার করতে হলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। আমি আগেই বলেছি, মানুষের যৌবনকে নিয়ন্ত্রণ করা একটি কঠিন কাজ। এ যৌবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, এ বয়স থেকে জীবনের অবক্ষয় শুরু হতে পারে। আর আস্তে আস্তে এ অবক্ষয় ধ্বংসের দ্বার পর্যন্ত ঠেলে দিতে পারে। আর তাই বাবা-মায়ের কর্তব্য, যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা। উপযুক্ত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হলে কিংবা তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলে তারা নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিয়ে দেয়ার পরও ছেলেমেয়েরা তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে, হোক না একটু কষ্ট কিন্তু বিনিময়ে তারা ইসলামের আদর্শরূপে গড়ে উঠতে পারে। রসূল করীম (সঃ) ছেলের মা-বাবাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি পুত্র সন্তান লাভ করে, তার উচিত সন্তানের উত্তম নাম রাখা এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া এবং যখন সে যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তখন তার বিয়ে দেয়া। সন্তান যদি যৌবনপ্রাপ্ত হয়, আর বাবা তাকে বিয়ে না দেয়, এ মত অবস্থায় সন্তান যদি পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তবে তার কৃত পাপ তার বাবার উপর বর্তাবে" (মেশকাত)।

বিয়ে-শাদী সম্পর্কে হুযূর (আইঃ)-এর দিক-নির্দেশনা ও জামাতের নীতিমালা ঃ

জামাতের বিয়ে শাদীর কার্যক্রমকে গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হুযূর (আইঃ) সম্প্রতি লন্ডনের মসজিদে ফযলে দু'টি জুমুআর খুতবা দিয়েছেন, যা ইতোমধ্যে 'বিয়ে শাদী' নামে পুস্তকাকারে বাংলায় অনুবাদ করে দেশের প্রতিটি জামাতে পাঠানো হয়েছে। উক্ত খুতবায় হুযূর (আইঃ) জামাতের বিয়ে শাদী সম্পর্কে বিশদ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, যা অবগতির জন্য আমি এখানে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি ঃ

লন্ডনের মসজিদে ফযলে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন, "জামাতের বিয়ে-শাদীর প্রতি ইতোপূর্বে যথেষ্ট দৃষ্টি দেয়া হয় নি। জামাতের অনেক বিয়ের যোগ্য কন্যা অবিবাহিত আছে। অপর দিকে অনেক বিয়ের যোগ্য যুবক, পসন্দ মত মেয়ে পাচ্ছে না। এক রইয়ার মাধ্যমে জামাতের বিয়ে-শাদীর সমস্যাটিকে একটি জটিল সমস্যা হিসাবে তাঁকে জানানো হয়েছে। এ সমস্যাটিকে গুরুত্ব সহকারে সমাধান করার জন্য উক্ত রুইয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলার তরফ থেকে তাঁকে দিক-নির্দেশনা সহ একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। খুতবায় বর্ণিত দিক-নির্দেশনাসহ বিয়ে সম্পর্কিত জামাতে আহমদীয়ার বিধি-নিষেধগুলো আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

(১) উপযুক্ত বয়সে ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয়া ঃ

যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়া বাবা মায়ের কর্তব্য। এ ব্যাপারে পাত্র পক্ষকে এগিয়ে আসার জন্য হুযূর (আইঃ) আহ্বান জানান। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেলে, তারা (ছেলে মেয়ে) উভয়েই অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত যৌবন উপভোগ করতে পারে।

(২) বিয়ের কনে নির্বাচন ঃ

আঁ হযরত (সঃ)-এর একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন, সাধারণতঃ ৪টি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিয়ের জন্য কনে নির্বাচন করা হয়, আর বিষয়গুলো হলো ঃ ১. কনের ধন সম্পদ, ২. তার বংশ গৌরব, ৩. তার দৈহিক সৌন্দর্য এবং ৪. তার ধর্মের প্রতি আগ্রহ। এই ৪টি বিষয়ের মধ্যে রসূল করীম (সঃ) বলেছেন," তোমরা ধর্মানুরাগী মহিলাকে বিয়ে কর, আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন।" আঁ হযরত (সঃ) আরও বলেছেন," পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তবে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি কল্যাণকর হচ্ছে ধর্মপরায়ণা পুণ্যবতী স্ত্রী" (সুনানে নাসায়ী)।

(৩) বংশ পরিচিতি ঃ

বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের বংশ পরিচয় নিয়ে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে হুযূর (আইঃ) বলেন, "বংশের আভিজাত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা সরাসরি অহংকার এবং আত্মগৌরবের পরিচায়ক। এটা শরীয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা।" হুযূর (আইঃ) আরও বলেন, "মানব সন্তান হযরত আদম (আঃ) এরই বংশধর। সকলেই আল্লাহ্র সৃষ্টি। সুতরাং অন্য কোন বাছ-বিচার না করেই বিয়ের জন্য সৎ ও সুপুরুষ হওয়াই যথেষ্ট।" ইসলাম ধর্মে বংশের তেমন গুরুত্ব নেই। তাকওয়া আর ভদ্রতাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই বেশি সম্মানীত, যে বেশি তাকওয়াশীল।" হুযূর (আইঃ) বলেন, "অন্য কোন বাছ-বিচার না করে বিয়ের জন্য সৎ ও সুপুরুষ হওয়াই যথেষ্ট"।

(৪) কনে দেখা ঃ

বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর পাত্র পক্ষ বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত কনেকে দেখতে পারেন। আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "বিয়ে করার আগে

পাত্র পক্ষ পাত্রীকে দেখতে পারে, কিন্তু তা একবার মাত্র" (মুসলিম, আবূ দাউদ)। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন, "এ দেখার মধ্য দিয়ে পাত্র-পাত্রী উভয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে কনে দেখতে গিয়ে পরদা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।"

(৫) দরিদ্র বাবা মায়ের ছেলে মেয়ের বিয়ে প্রসঙ্গে ঃ

আর্থিক অনটন, সংসারের অসচ্ছলতার কারণে জামাতের অনেক বাবা-মা তাদের বিয়ের উপযোগী ছেলেমেয়েকে যথা সময়ে বিয়ে দিতে পারে না। পরবর্তীতে তারা নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখী হন। জামাতের পক্ষ হতে এ সব ছেলে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে স্থানীয় জামাত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে হবে।

(৬) যৌতুক দাবী ঃ

পাত্রী পক্ষের নিকট যৌতুক দাবী করা ইসলামে নিষিদ্ধ। সূরা বাকারা এবং সূরা নিসার নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ্তাআলা কন্যার পিতার উপর একটি দাবী রাখেন, আর কন্যার স্বামীর উপর দু'টি দাবী রাখেন। কন্যার পিতার উপর অর্পিত দায়িত্ব হলো বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত মেয়ের ভরণ-পোষণ। আর স্বামীর দায়িত্ব হলো বিয়ের সময় মেয়ের মোহর দিয়ে দেয়া। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্ত্রীকে উপঢৌকন বা উপহার সামগ্রী দেয়া। ইলাহী সিলসিলাহ্র সদস্য হিসেবে আমাদেরকে সকল বিদা'ত পরিত্যাগ করতে হবে।

(৭) গয়র আহমদীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ঃ

গয়ের আহমদী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আহমদীয়া জামাতের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা আহমদীয়া জামাতের সমাজ আর গয়ের আহমদীদের সমাজ এক নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযিঃ) ১৯২০ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার বক্তব্যে বলেন, "যে কথাটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে গয়ের আহমদীদের সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে না দেয়া। যে ব্যক্তি কোন গয়ের আহমদীর কাছে নিজের মেয়ের বিয়ে দেয়, সে নিশ্চয়ই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে বোঝে না এবং আহমদী কি জিনিস তা-ও জানে না। তোমরা তো জাতিতে আহমদী হয়ে গেছো। এখনতো আহমদীয়তই তোমাদের জাতি, আহমদীয়তই তোমাদের পরিচয় এবং আহমদীয়তই তোমাদের বংশ মর্যাদা। তাহলে আহমদীদেরকে ত্যাগ করে, গয়ের আহমদীদের মধ্যে কোন্ জাতি খুঁজে বেড়াচ্ছ? মু'মিনের কর্তব্য তো এটাই যে, যখন সত্যের আবির্ভাব হয়, তখন সে মিথ্যাকে বিসর্জন দেয়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন যে, "গয়ের আহমদীদের কাছে আহমদী মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া গুনাহ্। আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যখন গয়ের আহমদীদের নিকট মেয়ে দেয়া গুনাহ্ বলে ঘোষণা করেছেন, তখন তোমরা কীরূপে সে ঘোষণাকে উপেক্ষা করে গয়ের আহমদীর কাছে মেয়ের বিয়ে দিয়ে থাকো? আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা গয়ের আহমদীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়, আর তা জায়েয হিসেবে দেখাবার জন্য অদ্ভুত সব ওজর-আপত্তি তোলে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাযিঃ) আরও বলেন, "গয়ের আহমদীদের নিকট মেয়ের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নফসের তাবেদারী করা নিশ্চয়ই তোমাদের উচিত নয়। বরং সব অবস্থায় তোমাদের উচিত যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আদেশ পালন করা হয়।"

(৮) সামাজিক কদাচার প্রসঙ্গে ঃ

বিয়ে উপলক্ষ্যে লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা, রুসুম রেওয়াজ পালন, গান বাদ্যের আয়োজন, অনর্থক অর্থের অপচয় বন্ধ করার জন্য জামাতে আহমদীয়ার পক্ষ হতে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, 'শরীয়তে শুধু এতোটুকু নির্দেশ আছে যে, পাত্র পক্ষ ওলীমা করবে। সকল বিদা'ত কর্মকান্ডকে লক্ষ্য করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাযিঃ) বলেছেন ঃ "নীতিগতভাবে আমি প্রত্যেক গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি গৃহের পরিবার-পরিজনকে আমি সম্বোধন করে একথা জানাতে চাই যে, আমি কদাচারের বিরুদ্ধে জেহাদের এলান করছি। আজকের তারিখ হতে যে সকল আহমদী পরিবার এসব বিষয় থেকে বিরত না হবে, সেসব পরিবার যেন এ কথা স্মরণ রাখে যে, খোদা আর তাঁর রসূল এবং তার এ জামাত ঐ সকল পরিবারকে কোনই পরওয়া করে না। বরং দুধের মধ্যে মাছি পড়লে, যেভাবে সে মাছিকে দুধ থেকে তুলে ফেলে দেয়া হয়, ঠিক সেভাবেই ঐসব লোকদেরকে জামাত থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব আপনাদের উপর রুদ্র মূর্তিতে আযাব নেমে আসার আগেই নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করুন।"

আপনারা স্মরণ করুন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে ইমাম মাহ্দী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা নির্যাতন আপনাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। অনেক অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়েছেন আপনারা। অনেককে জীবন দিতে হয়েছেন। কঠিন আধাত্ম্য সাধনার মধ্য দিয়ে আপনারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করেছেন। একের পর এক আল্লাহ্র জ্বলন্ত নিদর্শন দেখেছেন আপনারা। আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হবার সুযোগ পেয়েছেন। এত ত্যাগ, এত তিতিক্ষা, এত কুরবানীর পর দুনিয়ার সামান্য লালসায় পড়ে ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে কঠিন গোনাহ্কে খরিদ করবেন? কেন আপনাদের সময় মত সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কারণে আপনাদের ছেলেমেয়েরা আগুনে আত্মাহুতি দেবে? কেন আপনারা গয়ের আহমদীর সঙ্গে সম্পর্ক চান? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "যারা আমাদেরকে কাফির বলে, আর আমাদের নাম দাজ্জাল রাখে, তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক করার দরকার নেই।" যমানার খলীফার কোপানলে পড়ার মতো দুঃসাহস আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে। নিজের সন্তান-সন্ততিদেরকেও সাবধান করতে হবে। আমাদের ইহকাল পরকালের জন্য অর্জিত সমস্ত পুণ্যের বিনিময়ে আমরা কখনো দোযখের যন্ত্রণা খরিদ করতে চাইব না। অতএব দুগ্ধে পতিত মাছির মত জামাতের বাইরে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবার আগেই সাবধান হোন। আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হবার আগেই সবাই সাবধান হোন। আল্লাহ্তাআলাকে ভয় করুন।

- মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্তানাতা

"জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে আর কিয়ামতের দিন তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হইবে। অবশেষে যাহাকে দোযখের আগুন হইতে দূরে রাখা হইবে, এবং বেহেশ্‌তে দাখিল করা হইবে, সে-ই সফলকাম হইবে। এ দুনিয়ার জিন্দেগী তো ছলনা মাত্র" (সুরাতু আলে-ইমরান) "তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মরণ তোমাদের নাগাল পাবেই যদিও থাক অতি সুউচ্চ দূর্গে" (সূরাতুন্ নিসা)।

মানুষ মরণশীল। জন্মিলে মরিতে হয় ইহা বিশ্ব প্রভু মহান আল্লাহ্‌তাআলার অমোঘ বিধান। মরণের হাত থেকে কেউই রেহাই পাবে না। কিন্তু তবুও মানুষ মরতে চায় না। বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টার অন্ত নেই। মানুষ যদি তার মরণের কথা একবার ভেবে চিন্তে দেখে তাহলে সে কখনও অন্যায় বা পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে না।"তুমি বল, তোমরা যে মরণ থেকে পালিয়ে যাও, মরণ তোমাদেরকে নিশ্চয়ই ধরিবে, তারপর আল্লাহ্‌র নিকট ফেরত পাঠান হইবে, তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সব জানেন। এবং তখন তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা দুনিয়াতে করিতে" (সূরাতুল জুমুআ)।

আদি মানব হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কত লক্ষ কোটি অর্বুদ অর্বুদ মানুষ জন্মেছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত বড় বড় কবি সাহিত্যিক, বড় বড় দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, সমর নায়ক, দিক্‌বিজয়ী বীর জন্মেছে ও মরেছে, তার কোন হিসাব নিকাশ নেই। কত রাজা-বাদশা শাহানশাহ্ সম্রাট জন্মেছে যাদের দাপটে ভূকম্পিত হতো কেউই মরণ ছোবল থেকে রেহাই পায় নি। এমন কি বিশ্বনবী, যাঁর কারণে আল্লাহ্‌তাআলা আসমান জমীন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে তৎসমুদয় সৃষ্টি করেছেন, সেই রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত নবী করীম (সঃ) মরে গিয়ে মদীনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন। এমতাবস্থায় জলে স্থলে আকাশে পাতালে কেউই বেঁচে নেই এবং বেঁচে থাকতে পারে না। হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকেই চিরস্থায়ী করি নাই, সুতরাং যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহারা কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে?" (সূরাতুল আম্বিয়া)।

"নিশ্চয়ই তুমিও মরিবে এবং অবশ্য তাহারাও মরিবে" (সূরাতুয্ যুমার)।

"নিশ্চয় আমিই জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে" (সূরাতুল কাফ)। "তিনি জীবন ও মরণকে সৃজন করিয়াছেন তোমাদের মধ্যে কে সৎকাজে সবচেয়ে উত্তম তাহা পরীক্ষা করার জন্য" (সূরাতুল মূলক)

জীবন ও মরণ

বিশ্ব-স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌তাআলা মানুষের বাহ্যিকতা, শারীরিক সৌন্দর্য এবং অবয়ব দেখেন না, ধন-সম্পদ প্রভাব প্রতিপত্তি পদমর্যাদা সুউচ্চ অট্টালিকা ইত্যাদি দেখেন না। তাঁর দৃষ্টি মানুষের হৃদয়ের উপর। তাই হযরত রসূল করীম (সঃ) নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে তিন বার বলেছেন, "পরহেজগারী এখানে, পরহেজ-গারী এখানে, পরহেজগারী এখানে।" হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে রসূল (সঃ) কে সর্বাপেক্ষা উত্তম? উত্তরে হুযূর (সঃ) বললেন, "যার কথা কাজ আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট অর্থাৎ যার চরিত্র সর্বোত্তম এবং মরণ বেশি বেশি স্মরণ করে মানুষের মধ্যে তিনিই উত্তম, যার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হয়"। জিজ্ঞেস করা হলো কোন্ কর্ম সর্বোত্তম? উত্তরে হুযূর (সঃ) বললেন, মানুষের হৃদয়কে প্রফুল্ল করা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ক্লিষ্টকে সাহায্য, ব্যথিতের ব্যথা লাঘব ও নির্যাতিতের প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে তাহা দূর করা" তিনি আরো বলেছেন, "তোমার আপন আচরণের ফলেই তুমি পাইবে পুরস্কার এবং দন্ড, যেন ইহাই তোমার জন্য নির্ধারিত হইয়া আছে"। তাহারাই আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় শত্রু যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াও অবিশ্বাসীর কর্ম করে ও অযথা মানুষের রক্তপাত ঘটায়।" এ দুনিয়া মানুষের জন্য কর্মক্ষেত্র। ভাল মন্দ যে ব্যক্তি যে রকম কর্ম করবে, মরণের পর পরলোকে সে ব্যক্তি সেই রকম ফল ভোগ করবে। "সকলকেই মরিতে হইবে, প্রত্যেক জীবনকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, এবং আমি তোমাদিগকে ভাল ও মন্দ দ্বারা ভালরূপে পরীক্ষা করি। এবং আমারই নিকট তোমাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে" (সূরাতুল আম্বিয়া)। "ইহা সেই জান্নাত যাহার উত্তরাধিকারী আমরা বানাইব আমাদের বান্দাদের মধ্য হইতে সেই সব লোককে যাহারা পরহেযগার হইয়া রহিয়াছে (সূরাতু মরিয়ম)। "নিশ্চয়ই কুফরকারীদের জন্য আমরা শিকল, কণ্ঠকড়া ও দাউ দাউ করিয়া জ্বলা আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। নিশ্চয়ই পরহেজগার লোকেরা সেই পেয়ালা হইতে শরবত পান করিবে যাহাতে বেহেশতি কর্পুর মিশ্রিত থাকিবে। এ কর্পুর একটি নহর। আল্লাহ্‌র নেক ও পরহেযগার বান্দাগণ তা হইতে পান করিবে এবং ইচ্ছামত যেখানে খুশী বহিয়া লইয়া যাইবে" (সূরাতুদ্ দাহর)।

জীবন ক্ষণস্থায়ী। বেঁচে থাকটাই আশ্চর্য বলে বোধ হয়। কবে কার কখন মরণ হবে একমাত্র বিশ্ব-প্রভু মহান আল্লাহ্‌তাআলা ব্যতীত কেহই জানে না। বেঁচে থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই, তবুও মানুষ বেঁচে থাকতে চায় কিন্তু তা কখনও হবার নয়। "আমি তাহাদিগকে দুনিয়াতে সামান্য সময়ের জন্য আরাম উপভোগ করিতে দিব, অবশেষে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে তাড়াইয়া ব্যাকুল করিয়া দিব" (সূরাতু লোকমান)। একদিন না একদিন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলার সম্মুখে হিসাব নিকাশ এবং বিচারের জন্য দন্ডায়মান হতে হবে। "যখন তোমাদের মধ্যে কাহারও মরণ উপস্থিত হয় তখন আমার ফিরিশ্‌তারা তাহার প্রাণ সংহার করে এবং তাহারা কখনও ত্রুটি করে না। তখন তাহাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হয়। জানিয়া রাখ, বিচার একমাত্র তাঁহারই এবং তিনি শীঘ্র শীঘ্র হিসাব আদায় করেন" (সূরাতুল আনআম)।

"এবং নিশ্চয় আমিই জীবন দেই এবং মৃত্যু দেই এবং সকলের উপর আমিই সর্বাধিকারী। আমি তোমাদের অগ্রগামীদেরকেও জানি এবং তোমাদের পশ্চাৎ অবস্থানকারীদিগকেও জানি। নিশ্চয় তোমার প্রভুই সকলকে একত্রিত করিবেন, তিনি সব বুঝেন, সব জানেন" (সূরাতুল হিজর)। "অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তখন তিনি তোমাদিগকে তোমরা যাহা করিতে তাহা জানাইয়া দিবেন"(সূরা আনআম)। "আসমান ও জমিনের শাসন আল্লাহ্‌রই তিনিই বাঁচান এবং তিনিই মৃত্যু দেন। এবং তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন ত্রাণকর্তা ও নেই সাহায্যকারীও নেই" (সূরা তওবা)। "আমিই তো তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর বিধান (নির্ধারিত) করিয়া দিয়াছি এবং আমি এ বিষয়ে অক্ষম নহি" (সূরাতুল ওয়াকিয়া)

জীবন ও মরণ সবই আল্লাহ্‌তাআলার করায়ত্ব। মানুষ তাঁর এবাদত বন্দেগী করুক বা না করুক তাতে আল্লাহ্‌তাআলার কোন লাভ লোকসান নেই। একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, এবাদত- উপাসনার মধ্যে মানুষেরই মহা কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌তাআলা বড়ই কৃপাশীল। বান্দাগণ কোন্ পথে কোন সময় কীরূপে চললে দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করতঃ মরণের পর সুখ শান্তি ভোগ করতে পারে। সেই অনন্ত জীবনের মহা সুখ শান্তি লাভ করার জন্য কোন পথে কোন নেক আমল বা কর্ম দ্বারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তজ্জন্য পরম দয়ালু আল্লাহ্‌তাআলা নিজেই বিশ্বনবী হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর মাধ্যমে শিখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তাআলার দেখানো এবং শেখানো সঠিক পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে যখনই তাদের অধঃপতন ঘটে এবং অন্যায় অবিচার খুন খারাবি ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের

হানাহানি ইত্যাদি অমানবিক কর্মে লিপ্ত হয়, যে কারণে সমাজ জীবনে নেমে আশে অশান্তির কালো ছায়া, এমতাবস্থায় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌তাআলা দিশাহারা পথভ্রান্ত বান্দাগণকে সঠিক পথ দেখিয়ে মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করার নিমিত্তে যুগে যুগে এক একজন প্রেরিত পুরুষকে আবির্ভূত করেন। ইহা দয়াময় আল্লাহ্‌তাআলার অপরিবর্তনশীল বিধান। ইসলাম আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। যেখানে অশান্তি ও অরাজগতা, মনে করতে হবে সেখানে ইসলাম অনুপস্থিত। বর্তমান বিশ্বময় অশান্তি মানব জাতির চরম অধঃপতনের যুগেও আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কে আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করেছেন। তাঁর প্রতি ঈমান এনে তদনুযায়ী কর্ম করার মধ্যেই বিশ্ব -শান্তি নিহিত।

মানুষের মরণের অবস্থা বুঝতে হলে প্রথমে জন্মের অবস্থা বুঝা আবশ্যক। প্রথমে মানুষ এ দুনিয়ায় কিছুই ছিল না। আল্লাহ্‌তাআলার ইচ্ছায় পিতার ঔরষে মাতৃ গর্ভে দেহের সঞ্চার হয়। প্রথমে রক্তখন্ড অতঃপর মাংসপিন্ড, তৎপর হাড় অস্থি মজ্জা দ্বারা আস্তে ধীরে চক্ষু কর্ণ নাসিকা ইত্যাদি দিয়েই সজ্জিত করা হয়েছে। কিন্তু তখনও তার মধ্যে প্রাণ ছিল না। আল্লাহ্‌তাআলা সেই মৃত দেহে আত্মা বা রূহ দিয়েছেন তৎপর ভূমিষ্ঠ হয়েছে। অতঃপর ইহজগতে কিছুদিন জীবন যাপন করার পর মৃত্যু হবে। এবং ইহজগতে মানুষের কর্মফল অনুযায়ী মরণের পর অন্য এক অবস্থায় পতিত হবে স্বর্গে অথবা নরকে। জন্মই মানুষের ইহলৌকিক পরিভ্রমণের প্রথম অবস্থা এবং মৃত্যুই পারলৌকিক জীবনের প্রথম অবস্থা। মানব দেহ নশ্বর। মানবাত্মা অবিনশ্বর। মরণে আত্মার মৃত্যু ঘটে না। মৃত্যু মানুষের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন মাত্র। মরণে মানবাত্মা পর জীবন লাভ করে।

মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্‌তাআলা এক বিশেষ সৃষ্টি। তিনি যদি দয়া করে মানুষকে সৃষ্টি না করতেন। তাহলে মানব জীবন সম্ভব হতো না। মানুষের ইহ জীবন খুবই সংকীর্ণ, স্বপ্নের চাইতেও অতি ক্ষুদ্র বলে ধারণা হয়, যেন একপলকে কোথায় মিলিয়ে যায় ঠাহর করে উঠা যায় না। মরণে মানুষের আত্মা বা রূহ মরে না, নতুন জীবন লাভ করে। ইহ জীবনে ভাল মন্দ যে যা কর্ম করবে পর জনমে সে তার ফল ভোগ করবে। তবে প্রকৃতপক্ষে যাঁরা ঈমান আনে ও তদনুযায়ী আমালি সালে হতে খাঁটি মু'মিন তাঁদের জন্য কোন ভয় ভাবনা বা চিন্তার কারণ নেই। হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, "মরণ প্রকৃত মু'মিনীনের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার একটি অনুগ্রহ"। অতএব আসুন, একদিন না একদিন মরতে আমাদের হবেই। সুতরাং মরণকে সামনে জেনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার ভয় হৃদয়ে রেখে সংক্ষিপ্ত জীবনের আরাম-আয়েশ, লোভ-লালসা দলাদলি, রেষারেষি স্বার্থের হানাহানি ইত্যাদি অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে দূরে নিক্ষেপ করতঃ পবিত্র নির্মল ও নিষ্কলুষ অন্তঃকরণে করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলার দেখানো ও শেখানো পথে চলে মরণের পর অনন্ত জীবনের সওদা হাসিল করি। নতুবা মরণের পর নরকাগ্নীতে জ্বলে পুড়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে অনন্তকাল। পরিশেষে প্রার্থনা করি সত্যকে চিনে সেই পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা সকলের হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করে দিন, আমীন।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

নির্ভীক সাংবাদিক মোহাম্মাদুল্লাহ্ আর নেই!

কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নিরীক্ষণ পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ্ সাহেব গত ১ অক্টোবর, ২০০২ইং রোজ মঙ্গলবার রাত ৮ আটটায় কুমিল্লা শহরতলীর চাঁনপুরের বাসায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে.. রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী ১ ছেলে ও ৬ মেয়ে রেখে গেছেন।

শোক সংবাদ

মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামাত কুমিল্লার সদস্য ছিলেন। অনেক দেরিতে আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের সংবাদ পাওয়াতে তিনি প্রায়ই আফসোস করতেন।

গত ৪ঠা অক্টোবর, ২০০২ ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে তাঁর গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর শোকসংতপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর মর্ম বেদনা।

নির্বাহী সম্পাদক

■ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জনাব মোঃ খলীলুর রহমান সাহেবের বড় বোন বসন্তপুর নিবাসী জনাব এমদাদ হোসেন সাহেবের স্ত্রী রংপুর মেডিকেল কলেজে হাট ষ্ট্রোকে ভর্তি হওয়া অবস্থায় ৩০-৯-২০০২ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। জামাতের সকল ভাইদের নিকট মরহুমার রূহের মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আবেদন রইল।

- মোঃ জাহিদুর রহমান, অডিটর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

■ অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খাগদান-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব লুৎফর রহমানের দ্বিতীয় ছেলে ৩/১০/২০০২ তারিখ পানিতে ডুবে মারা গেছে (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)।

শিশুটির রূহের মাগফিরাত ও তার পিতা-মাতা এবং পরিবারের সকলের সাবরে জামীলের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- ডাঃ আব্দুল খালেক, বরিশাল

মজলিস আনসারুল্লাহ্, আহমদনগর এর ১ম বার্ষিক তা'লীমুল কুরআন ক্লাস ও স্থানীয় ইজতেমা সম্পন্ন

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০০২ হতে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহ্, আহমদনগর-এর ১ম বার্ষিক তা'লীমুল কুরআন ক্লাস ও স্থানীয় ইজতেমা সম্পন্ন হয়েছে।

২০ সেপ্টেম্বর ২০০২, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদ তা'লীম জনাব শফিক আহমদ ও কায়েদে মাল জনাব মসিউর রহমান এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ-এর উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়।

আহমদনগর মজলিসের যয়ীমে আলা খাকসার, সিলসিলা মুরব্বী মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মোয়াল্লেম জনাব আব্দুস সালাম ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় ৭দিন ব্যাপী ক্লাসে ৫৫ জন নিয়মিত আনসার কুরআন শিক্ষা লাভ করতে উপস্থিত হন। এর মধ্যে ৯ জন আনসারকে যারা কুরআন দেখে পড়তে পারতেন না তাদের শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি কায়েদ উমুমী মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, কায়েদ তাহরীকে জাদীদ জনাব আব্দুস সামী, আহমদনগর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ, খাকসারের উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশন ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

- মোহাম্মদ ইসরাঈল দেওয়ান
যয়ীমে আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ্, আহমদনগর

২২তম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমার প্রতিবেদন

আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে গত ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০২ইং বৃহস্পতি ও শুক্রবার খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২২তম বার্ষিক স্থানীয় ইজতেমা, ২০০২ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, আল্-হামদুলিল্লাহ্।

২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০২ দুইদিন ব্যাপী ২২তম বার্ষিক ইজতেমায় দীনি বিষয়ে কুরআন তিলাওয়াত. নযম, বক্তৃতা (বাংলা) দীনি মা'লুমাত পরীক্ষা (লিখিত) পয়গাম রেসানী, স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধূলার মধ্যে ছিল ঃ স্লো সাইকেল রেস, অন্ধের হাঁড়ি ভাঙ্গা, বালিশ বদল প্রভৃতি।

ইজতেমার উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জি, এম, হাফিজুর রহমান (জেলা কায়েদ খুলনা-যশোর) বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মোয়াল্লেম জনাব ফরহাদ হোসেন, এবং জনাব কায়েদ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া খুলনা ও আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা।

২৬ তারিখ বাদ মাগরিব ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমায় ২৫জন খোদ্দাম, ১০ জন আতফাল এবং ৪ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন।

- চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি

বৃহত্তর সিলেট জেলার ১ম তা'লীমুল কুরআন ক্লাস র্মশালা ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বৃহত্তর সিলেট জেলার উদ্যোগে গত ২০/৯/২০০২ইং হতে ২৫/৯/২০০২ইং পর্যন্ত অঞ্চল ভিত্তিক তা'লীমুল কুরআন ক্লাস এবং ২৬ ও ২৭ তারিখ কর্মশালা ও ইজতেমা ইসলামগঞ্জ এর বায়তুল ইসলাম মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০২ইং বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশন হয়। এতে কায়েদ তবলীগ মোহতরম আজিজুল হক সাহেব সভাপতিত্ব করেন। ২০শে সেপ্টেম্বর হতে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রুটিন অনুযায়ী ৬দিন ব্যাপী কুরআন ক্লাস, অর্থ সহ সালাত শিক্ষা, মালী কুরবানী, সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), তবলীগি আদব-কায়দা ও গুরুত্ব, ওফাতে ঈসা (আঃ), খতমে নবুওয়ত এবং ইসলাম নীতি দর্শন ও কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের উপর বিশেষ ক্লাস, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ২৬/৯/২০০২ইং সকাল ৯ ঘটিকায় কর্মশালা, সন্ধ্যা ৭.১৫

মিনিটে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশন। অনুষ্ঠানের ১ম দিন এবং শেষ তিন দিন বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২ইং নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭/৯/২০০২ইং বাদ মাগরিব খাকসারের সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন রিজিওনাল নাযেম তা'লীম ও তরবিয়ত জনাব এস এম হাবিবুল্লাহ্। চরম মোখালিফাতের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনটি মজলিস হতে আনসার ৭ জন, খোদ্দাম ১১ জন ও আতফাল ৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

- ডাঃ মোঃ রুহুল আমীন
জেলা নাযেম ও চেয়ারম্যান
প্রথম তা'লীমুল কুরআন ক্লাস কর্মশালা ও ইজতেমা

ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মীরপুর-এর উদ্যোগে ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ৭ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আল্হামদুলিল্লাহ্।

এতে খাদেম অংশ নেয় ২০ জন, তিফল ৩১ জন। উক্ত ইজতেমায় কুরআন, নযম, বক্তৃতা, সিলসিলার কিতাবের উপর লিখিত পরীক্ষা ও বিভিন্ন খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়।

- চৌধুরী লতিফ আহমদ, কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মীরপুর

মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের ২০তম ইজতেমা ২০০২ইং সাফল্যজনকভাবে সুসম্পন্ন

মোহতারম সদর সাহেবের সদয় অনুমোদনক্রমে আল্লাহ্তাআলার অশেষ ফযলে মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের ২০তম স্থানীয় ইজতেমা গত ২৭ ও ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০০২ইং (শুক্রবার ও শনিবার) দুইদিন ব্যাপী সাফল্যজনকভাবে স্থানীয় যয়ীমে আলা জনাব আহমদ আলী মোল্লা সাহেবের সভাপতিত্বে ও প্রধান অতিথি জনাব শেখ সফরুদ্দীন সাহেব জেলা নাযেমের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত ইজতেমায় ৬০ জন আনসার ও ১৫ জন খোদ্দাম উপস্থিত হয়। তাহাজ্জদ, তা'লীম তরবিয়ত লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, কুইজ, পয়গাম রেসানী, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা খেলাধূলা প্রতিযোগিতা সকলে অংশগ্রহণ করেন। কৃতীত্ব অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ হয়। বিচারকগণের মতে এবারের ইজতেমা সকল দিক দিয়ে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

- আহমদ আলী মোল্লা
যয়ীমে আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ্, সুন্দরবন

কুষ্টিয়া-যশোর জেলার জেলা ভিত্তিক তা'লীমুল কুরআন ক্লাস, কর্মশালা ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া-যশোর জেলার মজলিসের উদ্যোগে গত ২০ হতে ২৫শে সেপ্টেম্বর ০২ইং তারিখ পর্যন্ত জেলাভিত্তিক তা'লীমুল কুরআন ক্লাস, ২৬ সেপ্টেম্বর কর্মশালা ও ২৭ সেপ্টেম্বর বার্ষিক ইজতেমা উথলী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বায়তুস্ সোবহান মসজিদে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আল্ হামদুলিল্লাহ্।

২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বাদ জুমুআ উদ্বোধনী অধিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এতে উথলী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আব্দুল গফুর ও আঞ্চলিক তবলীগ কমিটির আহবায়ক মুহাম্মদ মুশাররফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। খাকসারের সভাপতিত্বে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২৫ জন আনসার সহ মোট ৩২ জন আহমদী অংশ গ্রহণ করে।

২০শে সেপ্টেম্বর হতে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রুটিন অনুসারে ৬দিন তা'লীমূল কুরআন ও অর্থসহ নামায শিক্ষা ক্লাস ছাড়াও তরবিয়তে আওলাদ, তবলীগের পদ্ধতি ও গুরুত্ব, বর্তমান সময়ে বিদা'ত, খতমে নবুওয়ত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আন্তর্জাতিক বয়াত এবং বুনিয়াদী মসলা-মাসায়েলের ওপর শিক্ষা ও বক্তৃতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লিখিত হাকীকাতুল ওহী পুস্তক থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ পড়ানো হয়। এ সব দিন সন্ধ্যার পর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তরবিয়তী অধিবেশন হয়। যেমন পর্দা, ছোটদের চরিত্রগঠন প্রভৃতি। তা'লীমূল কুরআন ক্লাসে নিয়মিত ছাত্র ছিল পনর জন আনসার। এ ক্লাসে ৩ জন আনসার প্রথম কুরআন করীম পড়াশুনা করে। মোয়াল্লেম মুনীর হোসেন কুরআন ক্লাস পরিচালনা করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলার ৭টি মজলিসের কর্মকর্তাদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মজলিসের বিভিন্ন কর্মসূচী ও চাঁদা আদায় পরিস্থিতিসহ সকল বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিষয়ে আলোচনা হয়। মজলিসের দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে করার বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আনসারগণ প্রোগ্রাম অনুসারে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৩দিন বাদ জুমুআ সমাপনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকার যয়ীমে আলা সৈয়্যদ আব্দুল হান্নান এবং কায়েদে সিহ্তে জিসমানী মুহাম্মদ সালাউদ্দিন আহমদ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন ২৮ জন আনসার এবং সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩৪ জন।

২০ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতি রাতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

- কওসার আলী মোল্লা
জেলা নাযেম, কুষ্টিয়া-যশোর ও
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি

বিশেষ দোয়ার এলান

খাকসারের ভাগ্নে বৌ খালেদা আলতাফ মল্লিক সুন্দরবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। তার কর্ম জীবনের সফলতা এবং খাকসারের ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনী সহ পরিবারের সবার উচ্চ শিক্ষার দীনের সেবার তৌফীক লাভের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

একই সাথে খাকসারের নেক বাসনা যেন আল্লাহ্তাআলা পূর্ণ করেন তার জন্যও খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

- আব্দুল ওয়াজেদ মল্লিক
সেক্রেটারী (যিয়াফত)
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমাদের কন্যা বুশরা আহমদ গত ২০০২ সনের আগষ্ট মাসে ইউনিভার্সিটি অব নর্থ কারোলিনা, চার্লোট থেকে Masters of Business Administration majoring in Information Technology Management -এ ডিগ্রী লাভ করেন। আল্লাহ্র ফযলে বুশরা ডিগ্রী লাভ করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের Dean's -তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করে।

বুশরা পেশাগতভাবেও সফলতার সাথে একটি বিখ্যাত কর্পোরেশন (Duke Energy corporation) এ Senior IT Application lead কাজ করছে। আল্লাহ্র আশিসে Charlotee, U.S -এর লাজনা সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে সে।

বুশরার আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কল্যাণের জন্যে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- নাজির আহমদ ও
বেগম নাজির আহমদ, চট্টগ্রাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে উগ্র মোল্লারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেখানে সাধারণ জনগণ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কোন স্বচ্ছ ধারনা রাখেন না। তাঁদের অবগতির জন্য আমরা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার নিজ লেখনী থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন ঃ

"আমরা ঈমান রাখি যে, খোদাতাআলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া। আমরা, ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দু মাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌'** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতাআলা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসেবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, তা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। ২ঃ২৫৭

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একনিষ্ঠ প্রেমিক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আঃ)

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা"

অর্থাৎ-সাবধান ! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (আইয়ামুস, সুলেহ্‌ পৃঃ ৮৬-৮৭)

তিনি আরো বলেন ঃ

"আমি সত্য বলছি এবং খোদাতাআলার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এবং আমার জামা'ত মুসলমান। এ জামাত আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ও কোরআন করীমের উপর ঠিক সেভাবেই ঈমান রাখে যেভাবে একজন সত্যিকার মুসলমানের ঈমান রাখা উচিত। ইসলাম থেকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ পদস্খলনকে আমি ধ্বংসের কারণ বলে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস হলো এক ব্যক্তি যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে পারে, যতটা আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য অর্জনে সক্ষম শুধুমাত্র আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার আনুগত্য ও পূর্ণ প্রেমের মাধ্যমেই সে তা লাভ করতে পারে, তা না হলে নয়। তাঁকে বাদ দিয়ে এখন পুণ্যের আর কোন পথ নাই।" (লেকচার লুধিয়ানা, পৃঃ ১২,মলফুযাত অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২২৫)

তিনি রসূল করীম (সঃ)-এর ভালবাসায় বলেন ঃ

"আদম সন্তানদের জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ছাড়া এখন আর কোন রসূল আর শাফী (যোজক) নাই। তাই তোমরা এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মহান নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা কর এবং কোনক্রমেই অন্য কাউকে তাঁর উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না, যাতে তোমরা আকাশে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হতে পারো। মনে রেখো, নাজাত (পরিত্রাণ) এমন কোন জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পরে প্রকাশ লাভ করবে বরং প্রকৃত নাজাত সেটিই যা এই দুনিয়ায় আপন জ্যোতিঃ প্রদর্শন করে। সত্যিকার নাজাতপ্রাপ্ত কে ? সে-ই, যে বিশ্বাস করে – আল্লাহ্‌তাআলা সত্য এবং মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর এবং সৃষ্টির মাঝে শাফী বা 'মধ্যবর্তী যোজক' এবং আকাশের নীচে তাঁর সমপর্যায়ের অন্য কোন রসূল নাই এবং পবিত্র কোরআনের সমমর্যাদায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থও নাই। অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্‌তাআলা চিরস্থায়ী জীবন দানের ইচ্ছা করেন নি, কিন্তু তাঁর মনোনীত এই নবী চিরকালের তরে জীবন্ত।"

(কিশ্‌তিয়ে নূহ, পৃঃ ১৩)

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP

Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆7th Issue October 15, 2002 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

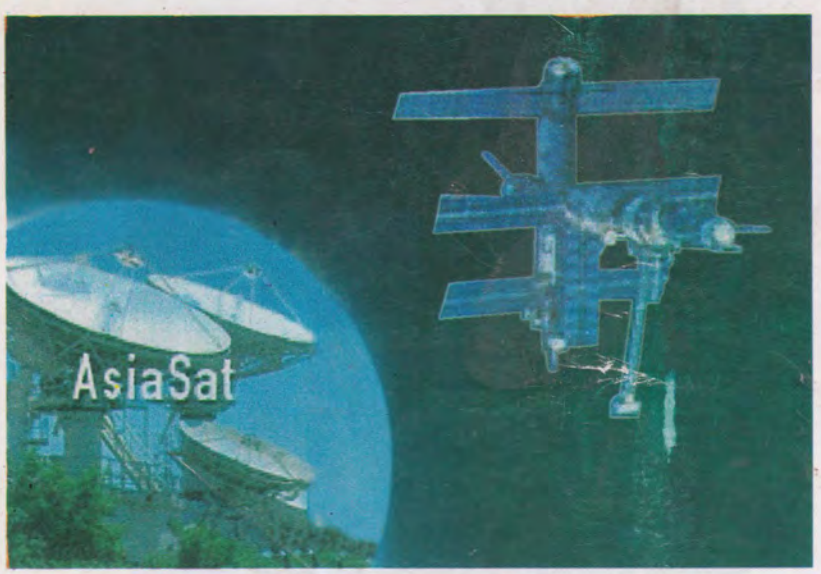

لا إله إلا الله محمد رسول الله

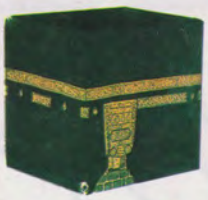

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com